লিলিয়ানা ও একটি ঘরবউনি সাপ

সাদিয়া সুলতানা



লিলিয়ানা ও একটি ঘরবউনি সাপ

সাদিয়া সুলতানা



লিলিয়ানা ও একটি ঘরবউনি সাপ

সাদিয়া সুলতানা



কেতাব-e প্রকাশনা

LILIANA O EKTI GHORBOUNI SAAP
Collection of short stories by
Sadia Sultana

লিলিয়ানা ও একটি ঘরবউনি সাপ

প্রথম কেতাব-e সংস্করণ: নভেম্বর, ২০২১
প্রচ্ছদের ছবি: অমৃতরূপা কাঞ্জিলাল (নাস্তাশিয়া কিনস্কির আলোকচিত্র অনুপ্রাণিত)
প্রচ্ছদ নামাঙ্কন: বাপ্পাদিত্য মণ্ডল
ই-বই প্রস্তুতকারী: দ্য বুকমেকার্স
www.thebookmakers.in

প্রকাশক: দিব্যেন্দু ঘোষ, টেকনো ভিশন
৫১ সি/২ডি/৪ অর্ধেন্দু শেখর নস্কর সরণি,
কলকাতা ৭০০০০১০, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

যোগাযোগ: info@ketab-e.net, +91-9433813450
অনলাইন বিক্রয়স্বত্ব: www.ketab-e.net
দাম: ১০০ টাকা (ভারত), $2.86 (ভারতের বাইরে)

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থাবলি:

চক্র (গল্পগ্রন্থ, ২০১৪)
ন আকারে না (গল্পগ্রন্থ, ২০১৭)
আমি আঁধারে থাকি (উপন্যাস, ২০১৮)
ঘুমঘরের সুখ-অসুখ (গল্পগ্রন্থ, ২০১৯)
মেনকি ফান্দার অপরাধ কিংবা পাপ (গল্পগ্রন্থ, ২০২০)
আজু মাইয়ের পৈতানের সুখ (উপন্যাসিকা, ২০২০)
ঈশ্বরকোল (উপন্যাসিকা, ২০২১)

সূচিপত্র

অশ্রুগাছ

জনশ্রুতি আছে, এই গাছের কাণ্ড বা শাখায় কেউ কোপ দিলে তার অনিষ্ট হয়। ঘোরতর বিপদ নেমে আসে তার জীবনে। অতি উৎসাহী কেউ কেউ অতিরঞ্জন করে বলে, গাছের সামান্য একটা ডাল ভাঙলেও নাকে-মুখে রক্ত উঠে দাপাতে দাপাতে মারা যায় মানুষ। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানে বুজরুক মাহদীপুর ইউনিয়ন পরিষদের ১নং ওয়ার্ডের সাবেক দফাদার দুলাল বাসফোড়।

দুলাল দফাদারের কংকালসার শরীরের চামড়া হাড়ের সঙ্গে লেগে থাকায় তাকে পাতাঝরা শুকনা ডালের মতো দেখায়। খরখরা শরীরে সে যখন গাছটিকে জড়িয়ে ধরে থাকে তখন তাকেও গাছের বাকল বলে ভুল হয়। গাছের সঙ্গে তার পলকা শরীর একাকার করে সে গাছের কাণ্ডে কান পেতে নানান গোপন কথা শোনে। পাতারা বাতাসের তরঙ্গে কেঁপে কেঁপে দুলাল দফাদারের সঙ্গে কথা বলে। গায়েবি কথোপকথন সেরে গলায় ঝুলানো বাঁশিতে ফুঁ দিয়ে জোরে জোরে সে হাঁক দেয়, 'হুঁশিয়ার, সাবধান।' কোনো ভয়ংকর বিপদ ধাই ধাই করে এগিয়ে আসছে সেই আগাম বার্তা পেয়ে দুলাল দফাদার দিগ্বিদিক ছোটে।

রাত নামলে ছেলেভুলানো গল্পের মতো রসিয়ে রসিয়ে হাটফেরত পথচারীকে দুলাল দফাদার নানান কাহিনিশোনায় আর ক্ষণে ক্ষণে হাঁক দেয়, 'সাবধান। হুঁশিয়ার।' চলতি পথে চৌকিদার জয়নুলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে আকাশের দিকে আঙুল তোলে, 'দ্যাখ, দ্যাখ, ঐ যে ঐ আসমানে উইড়া যায় নীলকণ্ঠ পাখি।' চৌকিদার জয়নুল দুলাল দফাদারের কথা শুনে অশরীরী ভয়ে চমকে ওঠে, মাথার ওপরে কারো ডানা ঝাপটানোর শব্দ শুনতে পায়, ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও গাছের দিকে তাকাতে বাধ্য হয়।

জমিদার হেমেন্দ্রকুমার দেহ রাখার পর তার আত্মা নীলকণ্ঠ পাখি হয়ে ঐ গাছে বাসা বেঁধেছে। ফড়ফড়ে ডানার ছোট্ট সেই পাখি আজও এ ডালে ও ডালে উড়ে বেড়ায়। সন্ধ্যা নামার পর থেকে গাছের নিচে লোকজন ভিড়ে না। রাতে জরুরি কাজে কেউ এই গাছের ধারের রাস্তা অতিক্রম করতে বাধ্য হলে সৃষ্টিকর্তাকে ডাকতে ডাকতে মুখে ফেনা তুলে ফেলে। লোকে বলে জমিদারের ভূত গাছে থাকে। শুধু দুলাল দফাদার না, প্রায় সকলেই জানে জমিদারবাড়ির বংশলতিকায় অতিকায় বৃক্ষের ভূতলভেদী শেকড়ের মতো শত শত কর্ম-অপকর্ম গ্রথিত আছে। তাই অতৃপ্ত আত্মার দায় মেটানোর আশংকায় বুজরুক মাহদীপুরের বাসিন্দারা এখনো কমবেশি তটস্থ থাকে।

এই জনপদের সমান বয়স গাছটির। যদিও জনপদটির পত্তন হয়েছে কোনকালে সেই বিষয়ে কোনো চাক্ষুষসাক্ষ্য নেই। বর্তমান বাসিন্দাদের কেউ যেমন এই লোকালয়ের জন্ম হতে দেখেনি তেমনি এই গাছের আয়ুরও সঠিক হিসাব নেই কারো কাছে। আকাশের দিকে মুখ করে বিপুল গাম্ভীর্যে বেড়ে ওঠা প্রাচীন গাছটির জন্মদাতারও কোনো হদিস নেই। এই ধরিত্রীই তার ধারক আর সে ধারক এই বুজরুক মাহদীপুর এলাকার মানুষের ঐতিহ্যের। সরকারি রাস্তার ধারে থাকায় মালিকান-শরীকান বিরোধ নেই গাছটি ঘিরে। মাঝে মাঝে তবু এই গাছকে ঘিরে নানান সংকটের উদ্ভব হয়।

বছর সাতেক আগে একবার গাছটির প্রকাণ্ড কাণ্ডে করাতের দাগ দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। গাছ কাটতে আসা সেই দুই মজুরের নির্মম পরিণতি ঘটেছিল। যদিও সেদিন দুর্ঘটনার আভাস পেয়ে দুলাল দফাদার চেয়ারম্যান সাহেবের হাতেপায়ে ধরে মিনতি করেছিল—তিনি যেন সরকারি লোকজনকে গাছ কাটতে নিষেধ করেন। চেয়ারম্যান সাহেব রাজিহননি। বেগতিক দেখে দুলাল দফাদার পড়িমরি করে নিজেই ঘটনাস্থলে ছুটেছিল। কিন্তু হোমড়াচোমড়া সরকারি কর্মকর্তাদের অনুমতি নিয়ে আসা লোকজন একটা আধপাগলা মানুষের নিষেধ শুনবে কেন। একসময় হাল ছেড়ে দিয়ে গাছের নিচে সটান দাঁড়িয়ে দুলাল দফাদার রহস্যমাখা হাসি হেসেছে আর বাঁশিতে ফুঁ দিতে দিতে হাঁক মেরেছে, 'হুঁশিয়ার, সাবধান।'

এরপর সেই অলৌকিক ঘটনাটি ঘটেছিল। যার সাক্ষী ছিল সমগ্র বুজরুক মাহদীপুরবাসী। দুজন জোয়ান তাগড়া মজুর ধারালো করাতের দুমাথা ধরে আধঘণ্টাটানাটানি করেও সেদিন গাছের বাকলে সামান্যতম আঁচড় দিতে পারেনি। তবে

ঐদিন রাতে মজুর দুজনের বাড়িতে কান্নার রোল পড়েছিল। রোগহীন শরীরে প্রচণ্ডযন্ত্রণায় দাপাতে দাপাতে মুখে ফেনা উঠেছিল তাদের। এরপর রাত পেরিয়ে ভোর না আসতেই তাদের স্ত্রীরা বিধবা হয়েছিল।

দফাদার দুলাল বাসফোড় সব জানে। দায়িত্বে নিষ্ঠাবান দুলাল দফাদার আজও দিন মানে না, রাত মানে না, গলায় বাঁশি ঝুলিয়ে পথে-ঘাটে টইটই করে ঘুরে বেড়ায়। এই ওয়ার্ডের প্রতিটি বাড়িঘর, ঝুঁকিপূর্ণ জায়গা, পাখপাখালি, গাছগাছালির খোঁজখবর রাখে সে। বিশ্বাস করে এই গাছের মৃত্যু ডেকে আনার সাধ্য নেই কারো।

সেই ঘটনার বছর পাঁচ পরে কালবৈশাখী ঝড়ে গাছটির প্রাচীন একটা ডাল ভেঙে পড়ে পথচারী আহত হওয়ার ঘটনায় গাছ কাটা জরুরি হয়ে পড়লেও সে আয়ুষ্মান হয়েছে পুনরায়। তৎকালীন বন কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে সরকারি গাছসমূহের নিলাম ডাক নিয়ে দুর্নীতি বিষয়ে স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি হবার সঙ্গে সঙ্গে সেবার ফেসবুকে শত শত পরিবেশবাদী মানুষ মুহুর্মুহূস্ট্যাটাস প্রসব করেছিল। এলাকার স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীসহ জেলা শহর থেকে সাংবাদিকেরা দলবেঁধে এসে গাছের নিচে হাতে হাত রেখে মানববন্ধন করেছিল। যার প্রেক্ষিতে বন বিভাগের অফিস প্রধানের বদলির পূর্বেই অগুনতি ফাইলের ভিড়ে চাপা পড়েছিল এই বৃক্ষনিধন কর্মসূচির ফাইল।

উল্টো গাছটিতে 'শতবর্ষী মেঘশিরিষ' নেমপ্লেট লাগিয়ে তার বিস্তৃত শেকড় ঘিরে ইট-সিমেন্টের গোলাকৃতি বেদী নির্মাণ করা হয়েছিল। যদিও দুলাল দফাদার গাছটির আন্দাজি বয়স বলে তিনশ বছর। শৈশবে দাদার কাছ থেকে শোনা আড়াইশ বছরের সঙ্গে নিজের প্রকৃত বয়স যোগ করে সে গাছের বয়স নির্ধারণ করে। দাদার কাছ থেকে শুনেছে সে, জমিদার হেমেন্দ্রকুমারের পিতা সুরেন্দ্রকুমার ভারত থেকে যে পাঁচটি গাছের চারা এনে তার কাচারি বাড়ির সীমানায় লাগিয়েছিলেন সেগুলোই এখন বুজরুক মাহদীপুরের দৃশ্যমান আদিম প্রাণ।

সুরেন্দ্রকুমার অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলেন। তিনি দৃপ্তপায়ে হেঁটে এসে যখন বাড়ির বাইরে দাঁড়াতেন তখন পুরো এলাকার মানুষের মাথা ভক্তিতে নত হয়ে যেত। ডান গালের লাল জরুলে হাত বুলাতে বুলাতে তিনি সকলের সুখ-দুঃখের খবর নিতেন। এই বাগানের বেশির ভাগ গাছ তিনি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে লাগিয়েছিলেন। এই মেঘশিরীষ গাছ তাঁরতদারকিতেই বেড়ে উঠেছিল।

বহুদূর থেকে দেখা যায় এই অবেলায় গাছের নিচের পাকা বেদীতে বসে আছে একজন প্রাণহীন লোক; পরনে দুমড়ানো-মুচড়ানো ধূসর শার্ট, দুহাঁটুর মাঝে গোঁজা লুঙ্গি। গাছটির কাণ্ডের দিকে পিঠ দিয়ে খালি পা ঝুলিয়ে সে অনড়বসে আছে। লাল রংয়ের বেদীর ওপরে তার দুই হাত পাতা। লম্বা লম্বা নখের ভেতরে কালো কালো ময়লা। দুহাতের বৃদ্ধাঙ্গুলের আধভাঙা নখে ফাংগাস পড়া। ভাঙাচোরা শরীরের লোকটির হাত-পায়ের খসখসে চামড়ার পরত সাপের পরিত্যক্ত খোলসের মতো দেখায়। হেমন্ত বাতাসের শীতল স্পর্শে সামান্য কেঁপে ওঠে সেই অদ্ভুত খোলস।

দিনের বেশিরভাগ সময় এই গাছের নিচের বেদীতে বসে আকাশ দেখে লোকটা। ঝিম মেরে দেখে পরিত্যক্ত জমিদারবাড়ির ভঙ্গুরদশা। বাড়িটির জায়গায় জায়গায় ইটের গাঁথুনি ধসে পড়েছে। দ্বিতল বাড়িটির ছাদের ওপর সুউচ্চ একটা হাওয়া ঘর। হাওয়ায় দুলতে দুলতে নির্জন হাওয়া ঘরে আজও মেঘ নেমে আসে। এ ঘরে ওঠার প্যাঁচানো লোহার সিঁড়িটির প্রায় পুরোটাই তুলে নিয়ে গেছে কেউ। সিঁড়ির সুচালো রেলিং হাওয়ার তালে বেকায়দাভাবে ঝুলছে। বাড়ির উত্তরে মজে যাওয়া বিশাল পদ্মদীঘিতে মার্বেল পাথরের বাঁধানো ঘাট। বর্ষাকালে এই দীঘির সামনে দাঁড়ালে গা ছমছম করে। কোনো কোনো বিজন দুপুরে লাল শাড়ি পরিহিত এক নারী মল পায়ে ঝুমুরঝুমুর শব্দে হেঁটে এসে ঐ দীঘির ঘাটে পা ছড়িয়ে বসে থাকে। একসময় চঞ্চল পায়ে সে দীঘিতে নামে, তাকে আর পাড়ে উঠতে দেখা যায় না। পদ্মদীঘির ঘাট নিথর নির্জন। এই দিকের গাছগুলোর একটা পাতাও কাঁপে না। দুষ্ট ছেলের দলও পদ্মদীঘির ঘাট এড়িয়ে চলে।

জমিদারবাড়ির সীমানা ঘিরে বড় বড় পাম, ডুমুর, অশ্বত্থ আর দেবদারু গাছ। বাড়ির সামনের বাগানে বিড়াল আচড়া, ফোস্কা বেগুন, জিরাকাটা আর চোরকাঁটার জঙ্গল। বাড়ির ভেতরে পায়ে হাঁটা পথজুড়ে নাম না জানা আগাছা আর উইয়ের ঢিবি। এমনই এক ঢিবি ভেদ করে একটা বাঁশের খুঁটিতে একটি কালো রঙের সাইনবোর্ড লাগানো, যাতে সাদা কালিতে লেখা, 'এই জমি নিয়া অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ট্রাইবুনালে মামলা চলমান। মামলা নম্বর ৯৯/১৩, দরখাস্তকারী নারায়ণকুমার, পিতা—স্বর্গীয় রবীন্দকুমার, প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ সরকার।'

রোদ-বৃষ্টিতে সাইনবোর্ডের অন্য কোনো শব্দ বা বর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত না হলেও রবীন্দ্রকুমারের 'র' ফলাটি হারিয়ে গেছে, যেমন করে জমিদার হেমেন্দ্রকুমারের জ্যেষ্ঠপুত্র রবীন্দ্রকুমার

হারিয়ে গেছে। নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া রবীন্দ্রকুমারের ওয়ারিশ মর্মে দাবিকরে নারায়ণকুমারের আবির্ভাব হবার প্রথম দিনেই এই বাগানে সাইনবোর্ডটি লাগানো হয়েছে। বুজরুকি কাণ্ড-কারখানা দেখে অভ্যস্ত বুজরুক মাহদীপুরের লোকজন এত বছর পরে রবীন্দ্রকুমারের ওয়ারিশ মর্মে দাবিকরা নারায়ণকুমারের এমন আবির্ভাবে কোনো প্রশ্ন তোলেনি। প্রশ্ন তুললেও ধূর্ত নারায়ণকুমার তাদের নিজের হাতে থাকা কাগজের গোছা দেখিয়ে দিতো।

জমিদারবাড়ির প্রবেশদ্বারের পশ্চিমে ভাঙা দেয়ালের পাশ দিয়ে প্রশস্ত রাস্তা তৈরি হয়েছে। এই গাছের নিচে বসলে সেই রাস্তায় সরাসরি চোখ যায়। প্রতিদিনের মতো লোকটার চোখ এবার সেই রাস্তায় আটকে যায়। আটকে যাবার মতোই সেই পথ।

আজ একটি মনোলোভা ছবি দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। জমিদারবাড়ির জঙ্গলে সাতটি চকচকে কাঠালিচাঁপা ফুল ফুটে আছে। সাদা পাপড়ির নিচ থেকে হলুদ রংয়ের ঘূর্ণি। সেই ঘূর্ণিতে প্রতিফলিত রোদে ফুলগুলো জ্বলজ্বল করছে। কারো নজরে পড়েনি, ফুলগুলোর মাঝখানে একটি পারুল ফুল অবাক বিস্ময়ে সূর্যমুখী হয়ে তাকিয়ে আছে। আশেপাশের নির্জনতা ছাপিয়ে ছলছল করে বাতাসের স্রোত বইছে। বাতাসের ডানায় ভর করে তামাটে পারুল আর সাতটি চাঁপার অলৌকিক সুবাস নাকে এসে লাগতেই লোকটির মুখ প্রসন্ন হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে বাতাসের পালকস্পর্শে তার চোখে-মুখে অজস্র স্বপ্নরেণু লেগে যায়। নড়েচড়ে বসে মাথা তোলে সে।

পাতার জাল ভেদ করে সে দেখে গাছের অবিন্যস্ত শাখা-প্রশাখার ওপরে অদ্ভুত একটা আসমান ঝুলে আছে। সঙ্গে ঝুলে আছে শতকোটি হীরক রোদ। বিচ্ছিন্ন রোদের ফালি তীব্রবেগে ছুটে এসে তার দৃষ্টিকে বিক্ষিপ্ত করে দেয়। পলক ফেলে দ্বিতীয়বার তাকাতেই চোখ আটকে যায় অগুনতি লালচে ফুলের ভুবনভুলানো রূপের দিকে। মেঘশিরীষের ফুলের পরাগকেশরগুলো জমিদারভঙ্গিতে ঊর্ধ্বমুখী। এবার হেমন্তেই ফুল এসেছে। অথচ তিন বছর আগেও গ্রীষ্মে ফুলে ফুলে ছেয়ে যেতো এর সবুজ শাখা-প্রশাখা। সুবাসিত ফুলের মোহন রূপ দেখে মোহাবিষ্ট প্রেমিকের মতো হাসে সে। তাই দেখে পারুল আর চাঁপা ফুলেরাও গলা জড়াজড়ি করে হাসে, সহস্র সুখের কল্লোলে নাচে।

হঠাৎ ওরা অবাক পাপড়ি প্রসারিত করে দেখে প্রাণপণে ছুটে আসছে দুলাল দফাদার। নিজের বয়সী ছায়ার সঙ্গে পেরে উঠছে না, তবু ছুটছে। মনে হচ্ছে তার শ্বাসের টান

উঠবে। অসময়ের বাতাসে ভেসে থাকা ফুলের রেণুতে তার শ্বাসের টান বাড়ে—সে কথা জানে না দুলাল দফাদার। বুক উজার করে শ্বাস নিতে গেলে তার পলকা শরীর বাতাসে দোলে। গায়ে চাপানো রংচটা নীল সরকারি পোশাকে তাকে কাকতাড়ুয়ার মতো দেখায়। হাঁপাতে হাঁপাতে গাছের নিচে বসা লোকটির সামনে থামে সে। সর্বশক্তি দিয়ে বাঁশিতে ফুঁ দেয়, 'ছোটকর্তা, সাবধান, হুঁশিয়ার... ।আবার ওরা গাছ কাটতে আসতেছে।'

দুলাল দফাদারের বাঁশিতে দেয়া প্রতি ফুঁয়ের সঙ্গে বেদনার শত টুকরা ঝরে পড়ে। 'ও ছোটকর্তা, মাথা তোলেন। ও ছোটকর্তা...' তার বাপ-দাদা জমিদার বাড়ির নুন খেয়েছে বহু কাল। সে নিজেও বাপের ভক্তি ছাড়েনি। হেমেন্দ্রকুমারের বংশবাতির নিভু নিভু শিখার সামনে সে নিজের দরদ ঢেলে দেয়, 'ও ছোটকর্তা, মাথা তোলেন। ওরা নীলকণ্ঠ পাখির বাসা ভাইঙা দিবো আইজ।'

মেঘশিরীষের একটা মোটা ডাল রাস্তার ধারের বৈদ্যুতিক তারের ওপরে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। আটচল্লিশ ঘণ্টাধরে এই এলাকার বৈদ্যুতিক লাইন বন্ধ। দুলাল দফাদারের হাঁকডাকে গাছের নিচে বসা লোকটির কোনো ভাবান্তর নেই। দুলাল দফাদার তার কানের কাছে বারকয়েক বাঁশি ফোঁকে। ছোটকর্তা কি আজ তার ওপর নারাজ হয়েছে? না সত্যিই তিনি এই দেশে নেই?

সরকারি সেরেস্তায় নোট আছে, 'গঙ্গানারায়ণপুর মৌজার সি.এস. ৩৪ নম্বর খতিয়ানের প্রজা শ্রী হেমেন্দ্রকুমারের কোনো বাংলাদেশিউত্তরাধিকারী বা উত্তরাধিকারীর কোনো বাংলাদেশিবৈধ স্বার্থাধিকারী না থাকায় তার সকল স্থাবর সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি গণ্যে ক তফসিলভুক্ত করা হলো।' এভাবে সরকারি কাগজে-কলমে লেখা হয়ে গেছে হেমেন্দ্রকুমার ভারতবাসী। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রকুমার, কনিষ্ঠ পুত্র দেবকুমার আর সর্বশেষ বাংলাদেশিউত্তরাধিকারী জিতেন্দ্রকুমারও ভারতবাসী। জমি অবমুক্ত করার মেয়াদও এখন তামাদি হয়ে গেছে। নিজেকে হেমেন্দ্রকুমারের ক্রমওয়ারিশ হিসাবে দাবিকরার সময়কালও তামাদি।

দুলাল দফাদার যতোই হাঁক তুলুক, ডাকুক, 'ছোটকর্তা, মাথা তোলেন', সে মাথা তোলে না। ডান হাত দিয়ে সে খসখসে গাল চুলকায়। গালের ঠিক মাঝখানে মাছির মতো বসে থাকা লাল জরুলটা খসে পড়তে গিয়েও বেমক্কা ঝুলে থাকে। হাওয়ায় ঝুলতে ঝুলতে পলকা শরীরের দুলাল দফাদার তার ছোটকর্তাকে ডেকেই চলে। সমস্ত বুজরুক

মাহদীপুরবাসীর মতোন দুলাল দফাদারও জানে এক বোতল মদের বিনিময়ে এক বিঘা জমি লিখে দেওয়া মানুষ জিতেন্দ্রকুমার ইন্দ্রিয়কে জয় করতে পারেনি। ইন্দ্রিয়ের স্বেচ্ছাচারিতায় বেসামাল ছোটকর্তা সাড়া দেয় না। দুলাল তবু তাকে জাগানোর ব্যর্থ চেষ্টা করে চলে।

মগ্ন চৈতন্যে হাবুডুবু খাওয়া লোকটাকে দেখে বোঝা যায়, সে আসলেই এদেশে নেই। ছোটকর্তার সাড়া না পেয়ে আবার ছুটতে শুরু করে দুলাল দফাদার। মুর্হুমুহু বাঁশি ফোঁকে আর হুংকার দেয়, 'সাবধান, হুঁশিয়ার...।' পথচারীরা হাসে, 'চাকরি নাই, তবু দিন-রাত দফাদারি।' ভ্রুক্ষেপহীন দুলাল দফাদার পথে-পথে ছোটে।

মেঘ ভার মন নিয়ে বেলা বাড়তে থাকে। হুট করে বুজরুক মাহদীপুরের সব রোদ হারিয়ে যায়। সেই সঙ্গে পথ হারায় নাম না জানা পাখির দল। একটি, দুটি...বিশটি পাখি। পাখিদের নতুন রেখাচিত্রে সামিল হতে দেখে আদুল আসমানে নতুন রং ফোটে। নীল রং। সেই নীলের বিষে আকাশ জরাগ্রস্ত হয়। মেঘেরহৃদপিণ্ডধ্বনিস্তিমিত হয়ে আসে। এবার দিকনিশানাহীন আলো গ্রাস করে নেয় লোকটির চোখের দুটি নীল মার্বেল। আলোর আঘাতে তার দৃষ্টি কাতর হয়ে ফের নতুন আবদারে আকাশমুখী হয়। এ এক মজার খেলা। সে জানে, বৃষ্টি নামবেই।

পতনোন্মুখমেঘ উঁকি দিয়ে বুজরুক মাহদীপুরের নীরবতা দেখে। হঠাৎ সকল নীরবতা বিদীর্ণ করে একটা খোলা জিপ এসে গাছের নিচে দাঁড়ায়। ব্যস্ত পায়ে যান্ত্রিক বাহনটি থেকে পাঁচ-ছয়জন মানুষ নেমে আসে। এদের মধ্যে স্যুট-টাই পরা সাহেব গোছের মানুষটি অন্যদের দিকে তর্জনী উঁচিয়ে আদেশের কণ্ঠে বলে, 'আশেপাশের লোকজন সরিয়ে ভেঙে পড়া ডালটি ভালো করে দেখে নাও।' গুরুগম্ভীর মানুষটির রাশভারি কণ্ঠ উপেক্ষা করে অদূরে দুলাল দফাদারের বাঁশি মুহূর্মুহূবাজে, 'সাবধান, হুঁশিয়ার...।' বাঁশির কর্কশ শব্দে চমকে উঠতে উঠতে লোকগুলো জিপ থেকে সাজসরঞ্জাম নামায়। এরপর ভীতু চোখে পদস্থ কর্মকর্তার দিকে তাকিয়ে তারা পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষা করতে থাকে।

এই দ্বিপ্রহরে সন্ধ্যার আলো শরীরে জড়িয়ে গাছের নিচে বসে থাকা লোকটিও অপেক্ষমান, গাছের মতো স্থিরস্তব্ধ। ক্রমশ লোকটির মাথার ওপরে গাছের পাতায় পাতায় জমা হতে থাকে তরল অন্ধকার। মৃদু হাওয়া বয়। অপস্রিয়মাণ হাওয়ার তালে সবুজে সবুজে দোলা লেগে অবিরাম অশ্রুবিন্দু ঝরতে থাকে। অশ্রুর সঙ্গে মেঘশিরীষের লাল লাল

ফুল টুপটাপ ঝরে পড়ে। পরাগকেশরে লেগে থাকা আলগা লাল রং তুলোপরশে লোকটির উসকোখুসকো চুলে, অমসৃণ ত্বকে লেগে যায়। তার গালের লাল জরুলটি এখন আরো লাল দেখায়।

গাছের নিচে একাকী বসে রং আর জলে ভিজতে থাকে দুলাল দফাদারের ছোটকর্তা। অলৌকিক জলধারায় স্নাত শরীরে তার অলীক শিহরণ জাগে, সাপের খোলস আর্দ্র হয়। অদূরে সাত ভাই চাঁপার পারুল বোনটি হঠাৎ আলোর নিশানা হয়ে জেগে উঠে বলে, ‘ভাই, ঐ গাছের আরেক নাম অশ্রুগাছ।’

(রচনাকাল: ২০১৯, গল্প সংকলন: মেনকি ফান্দার অপরাধ কিংবা পাপ)

মেহেরুন ও অনন্ত ঘুমকাল

গল্পেরও মৃত্যু ঘটে। যত্ন না নিলে সরস গল্পের ডালপালা শুকিয়ে যায়। তাই গল্পকারকে হতে হয় একজন পাকা শিকারি। মাছকে কোঁচের ঘায়ে আটকে ফেলতে না পারলে সেটি যেমন হাত ফসকে যায় তেমনি সময়মতো গল্পকে গাঁথতে না পারলে সেই গল্পও ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যায়। হারিয়ে যায় নিগূঢ় অন্ধকারে। যেমন করে মেহেরুনের গল্পও ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর শত শত মৃত মানুষের মতো।

মেহেরুন এখনও জীবিত আছে, যদিও ও নিজে তা স্বীকার করে না। ওর ধারণা ও পৃথিবী নামক ঘুমঘরে আটকে আছে। যেখানে জন্ম-মৃত্যুর মধ্যবর্তী কাল স্থির, সুখ-অসুখের অনুভূতি অভিন্ন ও ঘোরময়। তাই ওর বয়স বাড়ে না, দায়িত্ব বাড়ে না। দিন-রাতের বেশিরভাগ সময় দায়িত্বজ্ঞানহীন, নির্বিষ প্রাণীমেহেরুন ছাদের চিলেকোঠার ঘরে শুয়ে-বসে ঝিমায়। মাঝে মাঝে ওর আপাদমস্তক আবেগহীন কাঁপে—থরথর। কিন্তু মেহেরুন ফণা তোলে না।

মেহেরুনের ঘনিষ্ঠ বান্ধবী অনন্যা পাল এখন নেশায় ডুবে থাকা বান্ধবীকে নিজের চোখে দেখেও বিশ্বাস করে না, এ সেই মেহেরুন যে এই চিলেকোঠার ঘরে গলা ছেড়ে দেবব্রত সিংহের ‘ত্যাজ’ কবিতা আবৃত্তি করতো। জামবনের কুঁইড়েপাড়ার শিবু কুঁইড়ের বেটি সাঁচলির মানুষ হতে চাওয়ার ‘ত্যাজ’ কবিতা আবৃত্তি করতে গিয়ে যার কণ্ঠস্বর ফুঁসে উঠতো। অনন্যার স্মার্টফোনে মেহেরুনের আবৃত্তির ভিডিও ক্লিপ আছে। ইউটিউবে মেধা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবৃত্তি শুনে এক ঘণ্টার মধ্যে আত্মস্থ করা ‘মৃণালের পত্র’ পাঠরত মেহেরুনের ফর্সা মুখখানা সেই ভিডিওতে গনগনে লাল দেখায়। এখন ওর আগুনতেজ মৃত।

অনন্যা বছরখানেক আগেও হঠাৎ হঠাৎ বান্ধবীকে দেখতে আসতো। এসেই মেহেরুনের আবৃত্তির ভিডিও চালিয়ে ওর কাঁধে ঝাঁকি দিয়ে বলতো, ‘এই যে দ্যাখ, এটা তুই। দ্যাখ।’ একত্রিশতম বি.সি.এস-এ উত্তীর্ণ অনন্যা পাল এখন নিজ কর্মস্থলে এতই ব্যস্ত থাকে যে প্রাণপ্রিয় বান্ধবীকে ওর দেখতে আসার সুযোগ হয় না। দেশের প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা হবার ইচ্ছে মেহেরুনেরও ছিল। কিন্তু কচ্ছপ আর খরগোশের গল্পের মতো কে যে কখন জীবনরথে এগিয়ে যায় কেউ তা জানে না; স্বয়ং বিধাতাও বুঝি এ নিয়ে মানুষকে বিভ্রমে রাখেন। একত্রিশতম বি.সি.এস. পরীক্ষার প্রিলিমিনারিতে উত্তীর্ণ মেহেরুনের লিখিত পরীক্ষা দেবার সুযোগ হয়নি। এর পেছনে একটা গল্প আছে। যে গল্পটা এখন মেহেরুন ভুলে গেছে, ওর পরিজনরাও তা বিস্মৃতপ্রায়।

গল্পের সেই রাতে ঢাকা থেকে রাজশাহীগামী সিল্কসিটি ট্রেনের গন্তব্যে পৌঁছাতে অনেক দেরি হয়েছিল। মেহেরুন ট্রেনের একঘেয়ে ক্লান্তিকর ভ্রমণ শেষে প্রচণ্ড বিরক্তি নিয়ে প্লাটফর্মে পা রাখতে রাখতে প্রতিজ্ঞা করেছিল, চাকরির পরীক্ষা দিতে ও আর ঢাকা যাবে না। এ এক উটকো ঝামেলা। রেলস্টেশন থেকে বের হয়ে অটোর জন্য অপেক্ষায় থাকার সময়ও মেহেরুন বুঝতে পারেনি যে সামনে কী ভয়ংকর ঝামেলা ওর জন্য ওৎ পেতে আছে। দুএকটা অটোচালক ওর বাড়ির দিকে যেতে রাজি না হওয়ায় মেহেরুন রিকশার খোঁজ করছিল। ওর পাশে দাঁড়ানো লোকটির পরনে যে পুলিশের পোশাক ছিল তা প্রথমে খেয়াল করেনি মেহেরুন। আচমকা নিজের নিতম্বে ভারি কিছুর চাপ লাগাতে ও চমকে তাকিয়েছিল। সেই চাপ কোনো মানুষের থাবার তা মেহেরুন বুঝতে না বুঝতেই ওর ঘাড়ের কাছে কেউ একজন ঘন শ্বাস ফেলে জিজ্ঞাসা করেছিল, ‘রেট কতো?’ মেহেরুন উত্তর দেবার কোনো চেষ্টা না করে শরীরের সব শক্তি দিয়ে লোকটার গালে চড় বসিয়েছিল।

এরপরের ঘটনাগুলো খুব দ্রুত ঘটেছিল। দুদিন থানা-হেফাজতে থাকার পর মেহেরুন জানতে পেরেছিল ওর ভ্যানিটি ব্যাগে ১০৫ পিস ইয়াবা পাওয়া গেছে। ওকে প্রথম যেদিন আদালতে চালান দেওয়া হয়, সেদিন লালশালু ঘেরা রেলিঙের মাঝে উচ্চারিত মিথ্যেগুলো কী করে সত্যি হয়ে গিয়েছিল তা মেহেরুন নিজেও টের পায়নি। আসামীর ডকে দাঁড়ানো মেহেরুন সমাজ-সংসারের অন্য সব মানুষের মতো নিজের দিকে সন্দেহের চোখে তাকিয়েছিল। দ্বিধায় পড়েছিল, এ কোন মেহেরুন!

এ সেই মেহেরুন যে আজও জীবিত; কিন্তু জীবিত থাকলেও যে নিজের শরীরে লাশের গন্ধ পায়। লাশের গন্ধ কেমন, তা ও আগে জানতো না। মেহেরুন এখন জানে ওর শরীরজুড়ে যে গন্ধ বর্তমান তা কেবল ওর মৃত মায়ের শরীরেই আছে। মেহেরুনের মা রোমেলা আনাস মারা গেছে। হাজতিমেহেরুন মায়ের লাশ ছুঁয়ে দেখার সুযোগ পায়নি, ও বাড়ি ফেরার পর একজন পড়শির মুখে শুনেছিল যে গোসল করানোর সময় ওর মায়ের লাশ থেকে ফুলেল সৌরভ ভেসে এসেছিল, যা কোনো পরিচিত পার্থিব সুগন্ধি না। মেহেরুন এখন নিঃসঙ্গ ঘরে সেই সৌরভের মাঝেই ভেসে বেড়ায়। এ এক অদ্ভুত গন্ধমাদকতা, যা কেবল নেশার জগতে বুঁদ হলেই পাওয়া যায়।

মেহেরুন কোনো মরা বাড়িতে যাবার পর দেখেছে আশ্চর্য এক কুহক ছড়িয়ে পড়ে লাশের খাটিয়া ঘিরে আর মৃতের মাথার কাছে আগরবাতি ভুরভুর করে ধোঁয়া ছড়ায়। লাশকে ঘিরে থাকা ক্রন্দনরত স্বজনেরা গলার রগ ফুলিয়ে বিবরণ দেয় লাশটির মালিক কতটা দরদী, কতটা পুণ্যবান ছিলেন। এছাড়া লাশ নিয়ে মেহেরুনের বিশেষ কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। তবে এখন মেহেরুন জানে কী করে লাশ হয়ে পড়ে থাকতে হয়। এ খুব সহজ কাজ। মেহেরুন যখন নেশাতে বুঁদ হয় তখন ওর মন-মগজসহ সম্পূর্ণ শরীর ওর কাছ থেকে লোপাট হয়ে যায়। শরীর-মনে বেদনার বিন্দুমাত্র অনুভূতিও থাকে না তখন। এই চিলেকোঠার ঘরে মেহেরুনকে কে মাদক ‘হরষিনী’ সরবরাহ করে তার খোঁজ ওর বাবা রাখে না। মেহেরুনের বাবা এখন অর্ধমৃত, বিছানায় পড়ে থাকা প্যারালাইসিসের রোগী। এই বাড়িটা মেহেরুনের বাবা অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংক কর্মকর্তা কায়সার আহমেদের। দোতলা বাড়িটির চারটি ফ্ল্যাটের একটিতে মেহেরুনের বাবা আর তার দ্বিতীয় স্ত্রী নিশি থাকে।

মেহেরুনের গল্পের বয়ান করতে গেলে প্রাসঙ্গিকভাবে নিশির গল্পও চলে আসে, যা গল্পের অনেকটা জুড়ে বেকায়দা এক পাখির আধভাঙা জোড়ডানার মতো ছড়িয়ে থাকে। এবার তাই খানিকক্ষণ নিশির গল্প বলা যাক।

কায়সার আহমেদের দ্বিতীয় বিয়ের আগে থেকেই মহল্লার লোকজন কানাঘুষা করতো; সে এক নম্বরের চরিত্রহীন, লম্পট আর নিয়মিত গণিকালয়ে যায়। পুলিশের খাতায় নাম লেখানো মেয়ের হাজতবাস আর বুড়োকালে মেয়ের বাবার বিয়ের খবর শুনে পাড়া-প্রতিবেশীরা দিনের আলোতে এখন আর এই বাড়িমুখো হয় না; নিজেদের বউ-ঝির

ওপরেও নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। রোমেলা বেঁচে থাকতে কেউ কেউ অবশ্য লুকিয়ে রোমেলার সাথে দেখা করে জানিয়েছিল, নিশিই সেই নিশিকন্যা। রোমেলার দুর্বল হৃদপিণ্ডসেই খবরের চাপ সামলাতে পারেনি।

কায়সার আহমেদের মতো গণিকাসঙ্গে অভ্যস্ত দুচারজন পুরুষমানুষ নিশ্চিতভাবে নিশির পরিচয় জানলেও আজ অবধি তারা তা প্রকাশ্যে স্বীকার করেনি। অবশ্য এতে কারো কিছু আসে যায় না। নিশি যখন গৃহপরিচারক রাব্বিকে সাথে নিয়ে স্টেশনরোড কাঁচাবাজারের উদ্দেশ্যে রাস্তায় বের হয় তখন টঙ দোকানে চা পানরত পুরুষেরা আড়েআড়ে নিশির দিকে তাকায়। বড় উন্মাতাল সেই দৃষ্টি। ঘনঘন শ্বাস ফেলে তারা নিশির ছড়িয়ে যাওয়া পারফিউমের সুবাস নিজের ভেতরে টেনে নেয়। কয়েকপ্রস্থ পোশাকের আড়ালে থাকা সুডৌল শারীরিক গড়নের সাতাশ/আটাশ বছর বয়সী এই নারীকে দেখতে দেখতে একসময় তারা দম ফুরানো ভঙ্গিতে বসে থাকে। তারপর লম্বা একটা শ্বাস ফেলে সশব্দে কাপের ঠান্ডা চায়ে চুমুক দিতে দিতে বুড়ো বয়সে কায়সার আহমেদের ভীমরতি নিয়ে মুখরোচক আড্ডায় মাতে আর নিজেদের শরীর উষ্ণ করে তোলে।

এসব পুরুষের কেউ কেউ রাতে বিছানায় নিজের স্ত্রীর বুড়িয়ে যাওয়া শরীরে উত্তাপ ছড়াবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। উল্টোদিকে তাদের গৃহলক্ষ্মীরা সারাদিনের সাংসারিক পরিশ্রম শেষে নিজের নিরুত্তাপ শরীর নিঃসংকোচে পেতে দিয়ে স্বামীকে সন্তুষ্ট করতে পারার সুখযন্ত্রণায় মেকি সুরে গোঙায়। তখন তাদের পতিদেবতারা কায়সার সাহেবের সৌভাগ্যের কথা ভেবে ঈর্ষাকাতর হতে হতে মুচকি হাসে, 'বুইড়া খাটাসটার তো এখন আর খেইল দেখানোর বয়স নাই, শরীরও নাই।'

কায়সার আহমেদ নিশিকে বিয়ে করেছিলেন প্রথম স্ত্রী রোমেলার জীবদ্দশাতেই। তখন মেহেরুন মিথ্যে মামলায় হাজতে ছিল। চার মাস সাত দিন পরে মেহেরুন যেদিন বাড়িতে ফিরেছিল সেদিন বাবা-মায়ের শোবার ঘর থেকে মায়ের শাড়ি পরিহিত মেয়েটিকে বেরিয়ে আসতে দেখে ওর মাথায় রক্ত উঠে গিয়েছিল। ক্রোধে দিশেহারা হয়ে ও নিশিকে টানাহেঁচড়া করতে করতে চিৎকার করেছিল, 'তুমি শেষ পর্যন্ত একটা বেশ্যাকে ঘরে তুলেছো?' কায়সার আহমেদ প্রচণ্ড বেগে ছুটে এসে ওর দুগালে চড় মেরেছিল। মেহেরুনের ফর্সা গালে বাবার হাতের ছাপ বসে গিয়েছিল সেদিন। তারপর 'তোমার মতো

জানোয়ার, নোংরা মানুষের টাকায় থুতু দিই' বলে ঘর ছেড়েছিল মেহেরুন। ঘর ছেড়ে ও তখন সত্যি সত্যি নেশা ধরেছিল।

মেহেরুনের স্মৃতিকোষ মৃতপ্রায়। ও ভুলে গেছে, যে টাকাতে একদিন থুতু মারত সেই টাকার প্রয়োজনে কবে ও বাড়ি ফিরেছিল। আগে হঠাৎ হঠাৎ হাজিরা বাদ পড়ায় পুলিশ বাড়ি এসে মেহেরুনকে ওয়ারেন্টমূলে ধরে নিয়ে যেত, খণ্ডকালীন হাজতবাস শেষে ও আবার ফিরেও আসতো। নেশার জগতে তৈরি হওয়া নতুন বন্ধুরা উকিলের কাছে গিয়ে দুএকবার জামিন অপব্যবহার করা মেহেরুনের জামিনও করিয়েছে। সেই মামলায় খালাস পেয়েছে মেহেরুন, কিন্তু নেশার গারদে নিজেই নিজেকে বন্দি করেছে। প্রথম প্রথম বন্ধু-বান্ধব, হিতাকাঙ্ক্ষীরামা মরা মেয়েটার দুর্ভোগ দেখে ঠোঁটে চুকচুক শব্দ করে আফসোস করতো।

ধীরেধীরে মেহেরুনকে সবাই পরিত্যাগ করেছে। মেহেরুন ও তার পরিবারের সংশ্রব ত্যাগ করলেও মহল্লার লোকজন এখনো কায়সার আহমেদের বিয়ের মুখরোচক গল্পটি ভোলেনি। বরং সদ্য ভাজা মুড়ির মতো সেই গল্প এখনো মুচমুচে। তাদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু এখনো নিশি যে কামমেদুর নিশিতে মহল্লার পুরুষদের স্বপ্নে হানা দেয়, স্পর্শহীন চটুলতায় চলতি পথে তাদের কামার্ত করে। আর দিনশেষে নিশি হানা দেয় চিলেকোঠার ঘরে, যেখানে মেহেরুন নেশায় আপাদমস্তক ডুবে থাকে।

প্রথমদিকে নিশি মেহেরুনের কাছেও ঘেঁষতো না। কায়সার আহমেদ বিছানায় পড়ার পর এই বাড়ির তদারকির দায়িত্ব ঘাড়ে পড়ায় মেহেরুনের খোঁজখবরও নিশিকে রাখতে হয়। এই বাড়িতে চারটি ফ্ল্যাট। কায়সার আহমেদ যে ফ্ল্যাটে সস্ত্রীক থাকেন সেটি বাদে তিনটি ফ্ল্যাটের মধ্যে দুটির ভাড়া নিশির হাতে যায়। আরেকটির ভাড়া গত ছয়মাস ধরে মেহেরুন পায়, কখনো আবার পায় না। মেহেরুনের জন্য এই ব্যবস্থা করে দিয়েছে ওর বড় চাচা হায়দার। নিশির তীব্র আপত্তি সত্ত্বেও মেহেরুনের সিঙ্গাপুর প্রবাসী চাচা কুরবানি ঈদ উপলক্ষে দেশে আসার পর ভাতিজির জন্য এই ব্যবস্থা করে গেছেন। এ নিয়ে বিছানায় নিথর পড়ে থাকা কায়সার আহমেদকে এখনও কম গঞ্জনা সহ্য করতে হয় না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পেয়ে বিছানায় শুয়ে থাকা কায়সার আহমেদের অবশ্য এতে কোনো ভ্রুক্ষেপ হয় না। মেহেরুনেরও না।

জাগতিক বিষয়ে ভ্রুক্ষেপহীন মেহেরুন ঠিক এই মুহূর্তে চিলেকোঠার ঘরের চৌকাঠ বরাবর লম্বা হয়ে শুয়ে আছে। একটা ছায়া ওর শরীরের ওপর পড়ে। মানব শরীরের ছায়া দেখে মেহেরুন নারীর স্বভাবজাত তাড়নায় ধড়ফড় করে ওঠে না বা ওড়না টানতে ছোটে না। নির্জীব পড়ে থাকে। হঠাৎ কে যেন ওকে ডাকে। ডাকতেই থাকে, মে-হে-রু-ন, মে-হে-রু-ন... ।আষাঢ়ে বৃষ্টির নিরলস ঝরে পড়া শব্দের মতো সেই ডাক শুনে ও বুঝতে পারে না, এই সম্বোধনযোগ্য নামটা ঠিক কার। আবার কেউ ডাকে, মেহেরুন, মেহেরুন...। ছায়াশরীরটি ঝুঁকে পড়ে ওর কপালে হাত রাখে। এই মুহূর্তে স্বর্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার কোনো ইচ্ছে ওর নেই। কিন্তু মেহেরুনের জগৎবিচ্ছিন্নতা উপেক্ষা করে সে ডেকেই চলে...। এবার ডাকের পৌনঃপুনিকতা মাথার শক্ত খোলের ভেতরের নরম স্তরে বিষাক্ত সাপের দংশন বসিয়ে মেহেরুনকে জাগিয়ে তোলে।

বিরতিহীন ঘুমানোর মধ্যে যেমন একটা প্রশান্তি আছে তেমনি এভাবে আধোঘুমে আধোজাগরণে থাকার মধ্যেও তুমুল আনন্দ আছে, যা ওর নষ্ট করতে মন চাইছে না। আবার সেই ডাক, মেহেরুন, মেহেরুন...। ও চকিতে তাকায়। ওর দৃষ্টি ঘোরগ্রস্ত। এই দৃষ্টিতে বন্দুকের গুলিতে ঝাঝরা হয়ে যাওয়া বিক্ষিপ্ত স্বপ্নেরা নেশায় চুর হয়ে আছে। মেহেরুন এবার অনাকাঙ্ক্ষিতআহ্বান উপেক্ষা করে স্বপ্ন দেখে। স্বপ্ন দেখতে দেখতে মায়াবী একটা হাসি ওর ঠোঁটের ভাঁজে আলগোছে লেগে থাকে।

এই স্বপ্ন হরেক রকম। যে স্বপ্নে জুবেরি ভবনের সামনের রাস্তা ধরে অহেতুক গালগল্প করতে করতে এক ঝাঁক পায়রার সাথে একটি চঞ্চল মেয়ে উড়ে বেড়ায়। কবিতার নিমগ্ন প্রহর শেষে সন্ধ্যার ধূপছায়া আলোয় রিকশায় যেতে যেতে দুজন মানুষ প্রথম স্পর্শের মোহময়তায় বিভোর হয়; প্যারিস রোডের নতজানু গগনশিরিষের ছায়ার নিচে পাশাপাশি শব্দহীন হাঁটতে হাঁটতে হীনস্বাস্থ্যের ছেলেটির চিবুকে লেগে থাকা রোদরেখা দেখে মেয়েটি আনমনা হয়ে ওঠে। মেহেরুনও আনমনা হয়। কেউ ওর নাম ধরে ডেকে বলে, মেহেরুন, চল কফি খাই। শুনে ওর দুচোখের পাতায় আবার মখমলিস্বপ্ন নামে।

কফিশপের ঝাঁঝালো আড্ডায় মেয়েটি হৈ হৈ করে ওঠে, 'মামা, তুমি কোন দোকান থেকে চিনি কিনো গো? দাম কম পাও? না ওরা চিনি মুফতে দেয় তোমায়?' ছেলেটি অকারণ খুনসুটিতে মাতে, 'আরে না মামা, একেবারে ফার্স্টক্লাস কফি, ওপরে যে কদানা

কফিগুঁড়ো ছড়িয়েছো এর সাথে আরও কদানা চিনি মেরে দাও তো। আহ মামা, যা বানিয়েছো না...ইচ্ছে হচ্ছে তোমার হাতে চুমু খাই।'

ছেলেটি মেহেরুনের প্রাক্তন প্রেমিক। যে এখন দিনশেষে মেদসর্বস্ব শরীর নিয়ে তার ক্ষীণাঙ্গী স্ত্রীর ওপর হামলে পড়ে চুমু খায়। মেহেরুনকে ভুলে সবাই ভরপুর বেঁচে আছে। এমনকি মেহেরুনের প্যারালাইজড বাবারও একটা দাম্পত্য জীবন আছে, সুস্থ হবার স্বপ্ন আছে। অথচ মেহেরুনের কিছু নেই। এ কথা ও জানে। বিশেষ করে নেশার ঘোর থিতিয়ে এলে মেহেরুন ঘর ছেড়ে যখন ছাদে এসে দাঁড়ায় তখন বাতাসের কানাকানিতে ওর মনে হয়, ওর জীবনে এখন জীবন নেই। জীবনহীন শরীর বড় অপয়া। ভারি। যে পাথরশরীর টানতে ওর কষ্ট হয়, উপড়ে ফেলতেও কষ্ট হয়।

মেহেরুন উঠে দাঁড়ায়। ওর খুব ক্ষুধা পেয়েছে। এতক্ষণ বোঝেনি। নিঃশ্বাস টানতেই খাবারের গন্ধ ওর নাকে লাগে। মেহেরুন টেবিলের কাছে গিয়ে সরপোশের আড়াল থেকে ভাতের থালা বের করে। কাঁচা পেঁয়াজের হলদেটে আলুভর্তা ঘেমে শাদাটে হয়ে গেছে। ও ভর্তার অর্ধেকটা খায় আর অর্ধেকটা ঘরের কোণে ছুঁড়ে মারে। ঘরটি এমন অনেক খাদ্যাংশ আর আবর্জনায় ভরা। এই ঘরে একজন মানুষ শোবার মতো একটা খাট, ঘুণেধরা টেবিল, চেয়ার আর একটা আর.এফ.এল এর প্লাস্টিকের টুল আছে। ঘরের পশ্চিমকোণে কোনোরকমে দাঁড় করানো একটা আধভাঙা আলনায় মেহেরুনের গোটাকতক সালোয়ার কামিজ, আধময়লা অন্তর্বাস বেকায়দাভাবে ঝুলছে। মেহেরুন টুলে বসে কাচকি মাছের চচ্চড়ি দিয়ে আঠালো ভাতের কয়েক দলা মুখে নেয়। এরপর বোতলে মুখ রেখে ঢকঢক করে পানি খায়। গলায় পানি আটকে গিয়ে কাশতে কাশতে ও হাসে, 'কে আমার নাম নেয়!'

—এত দেরি কইরা ভাত খাও ক্যান? নেশা কইরা সুখে পেট ভইরা ছিল?

মেয়েটিকে প্রথমে চিনতে পারে না ও। যখন চিনতে পারে তখন ওর মন চলে যায় অচেনা পথে। যে পথে অনন্ত বিতৃষ্ণার চোরাবালি। ঘরের মেঝেতে একটা পাখির পালক পড়ে আছে। মেহেরুন সেটা তুলে নিয়ে নিচের দিকের ভারি অংশ সরিয়ে সামনের কোমল দিকটা দুআঙুলের ভাঁজে মোলায়েম করতে থাকে। পালকটির অগ্রভাগ ডান কানের ভেতরে ঢুকিয়ে আলতো করে ঘুরাতে ঘুরাতে আবেশে ওর দুচোখের পাতা বুজে আসে।

—কোন পাখির পালক গো এটা? এত আরাম? পরের বার এলে ডেকে দিও, দুটো গল্প করবো। ও যাবার সময় দুটো পালকও ছিঁড়ে রাখবো।

নিশির মাথা থেকে পা পর্যন্ত চিড়বিড়ে রাগ ছড়িয়ে পড়ে।

—আমারে দেখলেই যতো ভোগলামি। ওই যে কয় না, জাতে মাতাল তালে ঠিক! তুমি গতকাল রাইতে রাব্বিরে কী বলছো?

মেহেরুন জবাব দেয় না। ওকে নিশ্চুপ দেখে নিশি তেতে ওঠে।

—তুমি কি রাব্বিরে নিচতলার গফুর সাবের কাছ থেইকা ভাড়ার ট্যাকা আনতে বলছো?

চোখের কোণের পিঁচুটি সরাতে সরাতে মেহেরুন নিশির দিকে তাকায়। মেহেরুনের চুল রুক্ষ, মুখ অপরিচ্ছন্ন। ওর মুখে হাসি ফোটে। হাসতে হাসতে ও ঠোঁটের কোণের ফুস্কুড়ি পরিষ্কার করে।

—রাব্বি খুব ভালো। ওর সাথে আমার মায়ের দেখা হয়। ওর কাছে মা আমার জন্য গাদি গাদি জোছনার ফুল দেয়।

মেহেরুনের কথা শুনে নীল বিষে নিশির মুখশ্রীর ভরাট সৌন্দর্য হারিয়ে যায়। একটা ফণা তোলা সাপের চেরা জিভ হিসহিসিয়ে ওঠে,

—ন্যাকামি কইরো না। আমার কাছে ওইসবের ভাত নাই। তুমি কোনো ভাড়ার ট্যাকায় হাত দিতে পারবা না। তোমার যা লাগবো আমি দিমু। বইসা বইসা দুইবেলা ভাত খাইতেছ, আল্লাহর কাছে শোকর করো।

—ভাতে বকুল ফুলের গন্ধ। থোকা থোকা শাদা বকুল।

বাতাসের কল্লোলে দুটো অলকানন্দা ফুল উড়ে এসে মেহেরুনের পায়ে লুটায়। গন্ধহীন হলুদ ফুল দুটো হাতে তুলে নিতেই ও শুনতে পায় ফুলেরা বিপুল ফুর্তিতে কানাকানি করছে, ‘মা, ভালো আছে। খুউব ভালো আছে।’ মেহেরুন ভাঙাভাঙা হাসিমুখে নিশির দিকে তাকায়। ওর দৃষ্টি অস্বচ্ছ। যেখানে ঘৃণার ক্লেদ নেই, ক্রোধের দহন নেই। তবু সেই দৃষ্টিতে কিছু একটা দেখতে পেয়ে নিশি চমকে ওঠে। ওর মনে পড়ে, এই নেশাখোর মেয়েটা প্রথম দেখার দিন প্রবল আক্রোশে ওর মুখে থুতু দিয়েছিল। ওকে বিশ্বাস করা যায় না। হোক না, বিষদাঁত ওপড়ানো। যে কোনো সময় যে কোনোকিছু করে ফেলতে পারে। কয়েক পা পিছু হটে তর্জনী উঁচিয়ে নিশি সতর্কবাণী শোনায়,

—কাছে আগাইবা না। বেশি ফড়ফড় করলে ডানা দুইটা কাইটা দিমু। বাপের মতো বিছানায় পইড়া থাকবা, মুখ দিয়া লালা ঝরবো। নেশা তো দূরের কথা, মুখে এক লোকমা ভাতও জুটবো না।

নিশি আর দাঁড়ায় না। ধোঁয়াহীন অনলে পুড়তে পুড়তে ও সিঁড়ি ধরে নিচে নেমে যায়। খানিকক্ষণ ওর ধুপধাপ পদশব্দ শোনা যায়। নিশির উৎকণ্ঠা মিথ্যে প্রমাণ করে মেহেরুন ভাবলেশহীন দাঁড়িয়ে থাকে যেন ও একটা বোবাবৃক্ষ, যার পাতাহীন শাখা-প্রশাখা নতজানু। শত আঘাতেও ওর ভেতরে অনুভূতির কোনো কম্পনের সৃষ্টি হয় না। দূর থেকে দেখলে মনে হয় শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সাড়হীন মেহেরুন তালিদেওয়া জীবনের গতিহীনতায় আটকে গেছে।

নিষ্প্রভ, নির্বাক মেহেরুন অবিন্যস্ত পা ফেলে ছাদের মাঝখানে দাঁড়ায়। ওর শরীরে নরম বাতাসের ছোঁয়া লাগে। বাতাসে বকুল ফুলের ঘ্রাণ। এই ঘ্রাণে মাখামাখি করে থাকে শৈশব-কৈশোরের মোহন সুখ। সেই সুখে কাকতাড়ুয়া মেহেরুনের শরীর কাঁপে যে কম্পনে কোনো বিদ্যুৎচমক থাকে না। বাতাসের শূন্যচিত্রের দেয়ালে ও রঙচটা পোস্টারের মতো সেঁটে থাকে। দীপ্তিহীন মেহেরুনের 'ত্যাজহীনতা' এবার বাতাসকে বিমর্ষ করে। বাতাসের মন খারাপের দোলায় সন্ধ্যার ম্লান আলোটুকু ফুরিয়ে যায়। আকাশের স্লেটে পাখিদের যুক্তাক্ষরে তৈরি হতে থাকে নানান জ্যামিতিক রেখা। সেই রেখা দূরে, বহুদূরে যেতে যেতে ক্রমশ মিলিয়ে যায়। আবছা আলোতে ফিরে যাবার সুতীব্র বাসনা দেখা যায় না আর। একসময় আকাশের গা উপচে পড়া অন্ধকারে শেষ আলোটুকু উবে গিয়ে পৃথিবী অনন্ত ঘুমকালে বন্দি হয়ে যায়। সেই সাথে অন্ধকারে হারিয়ে যায় মেহেরুন। মেহেরুনের গল্পও।

(রচনাকাল: ২০১৮, গল্প সংকলন: ঘুমঘরের সুখ-অসুখ)

সুখ ও প্রাপ্তি বিষয়ক

বাদলকে আমি ঈর্ষা করি কিনা বুঝতে পারি না। নাকি সমীহ করি বাদলের জীবনবোধ? সংগোপনে উত্তর হাতড়াতে গিয়ে বুকের বাম দিকে চিনচিনে একটা অনুভূতি হয়। ঈর্ষা আর সমীহ শব্দ দুটির বহিঃপ্রকাশ নীরবতাতেই বেশি শোভনীয় বলে আমি আপাতত চুপ থাকি। বাদলের দিকে তাকাই। ও সাড়ে চারটার দিকে আমার অফিসে এসেছে। মামুন ভাইকে বলে ওর সঙ্গে একটু আগে অফিস থেকে বের হয়েছি। বাদলের সঙ্গে আড্ডা দেয়ার লোভ সামলানো প্রায় অসম্ভব। বাদল কফির মগ এগিয়ে দেয় আমার সামনে, 'নে দোস্তো, শুরু কর।'

বাদলের চোখে আমার মনের বিপরীতমুখী দ্বন্দ্ব ধরা পড়ে না বলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলি। ও কফিতে চুমুক দেয়। পথক্লান্ত রিকশাওয়ালার মতো তৃপ্তি নিয়ে বাদল ছুড়ুৎ ছুড়ুৎ শব্দ করে কফি খাচ্ছে। এতো পানীয় পান করা নয়, রীতিমতো খাওয়া। কর্পোরেট কালচারে অভ্যস্ত আমার ভেতরে এই শব্দের অনভ্যস্ততা ভীষণরকম অস্বস্তি তৈরি করছে। আমাদের পাশের টেবিলে একটা মেয়ে বসে আছে। মেয়েটার সঙ্গে তার প্রায় সমবয়সী একটা ছেলে ছিল। দুজনের হাল ফ্যাশনের ড্রেস আপ, হাতে দামী আইফোন। দুজন খানিকক্ষণ আগে খুনসুটি করতে করতে সেলফি তুলছিল। ছেলেটা কোথাও গেছে। আশেপাশে দেখতে পাচ্ছি না। মেয়েটার বয়স বিশ বছরের মতো হবে। ভার্সিটি পড়ুয়া হয়তো। প্রেমিকের সঙ্গে নিরিবিলিতে সময় কাটাতে এসেছে। মেয়েটা যতো না সুন্দরী তার চেয়ে বেশি আকর্ষণীয়। জিনস আর ফতুয়ার সঙ্গে গলায় ঝোলানো রংধনু স্কার্ফে মেয়েটাকে দৃষ্টিকাড়া সুন্দর লাগছে। মেয়েটার দৃষ্টি অবশ্য এখনও বাদলের দিকে।

বাদলের কফি খাওয়া দেখে মেয়েটা ওর সামনে থাকা কোল্ড কফির স্ট্রতে ঠোঁট রেখেও টান দিতে ভুলে গেছে। স্কাই ভিউ ক্যাফেতে জিন্স প্যান্ট আর হাল ফ্যাশানের

গেঞ্জি পরা যুবককে শব্দ করে কফি খেতে দেখে মেয়েটার মতো আমিও নিদারুণ অস্বস্তিতে বাদলের দিকে তাকাই। কিন্তু কিছু বলি না। আমি জানি বাদল এমনই। গত আট বছরের দীর্ঘ ছেদেও বাদলের কোনো স্বভাব আমি ভুলিনি। বাদল মোটেও বদলায়নি। আমি কফি খাওয়া বন্ধ করে বাদলের শেষ চুমুকের অপেক্ষা করি। ও একইভাবে আওয়াজ করে কফিতে চুমুক দিচ্ছে। একবার সেই মেয়ের দিকে চোখে চোখ পড়তেই বাদল হাসলো, লজ্জা পেলো না, বরং মেয়েটাই লজ্জায় নিজের কফি পানে মনোযোগ দিলো।

আমি বাদলকে নিশ্চুপ দেখে প্রশ্ন করি, ‘কী করছো আজকাল? ফেসবুকে তো অ্যাবাউটসে কিছু খুঁজে পাই না। অবশ্য নিয়মিত বসা হয় না আমার।’

—কিছু করা বলতে তুই যদি চাকরি করা বোঝাস তাইলে কিছুই করতেছি না।

—কিছুই না মানে?

—তুই মনে হয় জানোস না মাসুদ, আমার কোনো চাকরি টিকে না।

—তা এখন কি বেকার আছো?

—বেকার থাকবো ক্যান! আরে শালা একটা যায় তো আরেকটা পাই। সুবিধা আছে, বুঝলি মামু। ফেসবুকে আর কত পাল্টামু নিজের জব ডেসক্রিপশন!

—অত চাকরি পাও কোথায় বন্ধু? আমি তো একটা রাখতেই হিমশিম খাই।

—আরে দূর মানুষ আবার গোলাম না রাখে। বাঙালি গোলাম প্রিয়। চাকরি ঠিকই জুইটা যায়। ছাইড়াই দ্যাখ না একবার। একটা গেলে পাঁচটা পাবি।

আমি বাদলের মতো অনায়াসে বন্ধু-বান্ধবকে তুই তোকারি করতে পারি না। তেমনি অনায়াসে চাকরিও ছাড়তে পারি না। এই তো গতবছর আমাকে ডিঙিয়ে জুনিয়র ছেলেপেলের প্রোমোশন হওয়ায় অভিমান করে চাকরি ছাড়ার কথা ভেবেছিলাম কিন্তু ঝুঁকিহীন জীবনের লোভে তা আর ছাড়তে পারিনি। রাহাত সেদিন চ্যাটিংয়ের সময় বলছিল বাদলের চাকরি ছাড়ার রোগের কথা। আমাকে সাবধানও করেছে, এসব ছেলে ধান্দা করে টাকা ধার চাইতে পারে। কিন্তু আমি জানি বাদল ধার চাওয়ার মতো ছেলে না। তাছাড়া আজ বাদলের পরিচ্ছদই বলে দিচ্ছে আর্থিক অসচ্ছলতা নেই ওর।

—এখন তাহলে কী করছো?

—সামনের মাসে একটা ফার্মে জয়েন করার কথা। দেখি।

—কাজ নাই, দেখাদেখির কী আছে, ঢুকে যাও।

—তা একপ্রকার ভালোই বলছস। তবে দোস্তো চাকরির চাইতে কিন্তু ব্যবসা ভালো। মাঝখানে কিছুদিন বিকাশের এজেন্ট হইছিলাম বুঝলি, লাভ খুব একটা খারাপ না। পরে ছাইড়া দিলাম। কম্পিটিশন বাইড়া গেল।

ওর কথা শুনে আমি শব্দ করে হাসি।

—হাসিস না। দ্যাশে ব্যবসা করা মানে বিরাট ঝক্কি।

—তোমার রেজাল্ট তো অত খারাপ ছিল না। গ্রেড ভালোই ছিল। ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে বিকাশের ব্যবসায় গেলে?

—অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য গেছি রে মামু। আগের ফার্মটার ম্যানেজারের সাথে ঝামেলা হইল রাগের মাথায় চাকরি ছাইড়া দিলাম। অইটাই সবচেয়ে বেশিদিন করছি। বছর দুই। অনেকবার মনে মনে চাকরি ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিলেও আমার বউ তাহেরার কান্নাকাটিতে চাকরি ছাড়ি নাই। ছাড়ার পর নিজের কিছু জমানো টাকা আর তাহেরার কাছ থেইকা কিছু টাকা নিয়া বিকাশের ব্যবসা করলাম গত এক বছর। সাথে পোলট্রির ব্যবসাও করছি। ব্যবসা করতে গিয়া লাভ হইছে প্রচুর।

—বাহ! কেমন প্রফিট এতে?

—আরে দোস্ত ট্যাকার লাভ না। জ্ঞান লাভ।

বাদল নিজের কথায় মজা পেয়ে নিজেই হাসে। ওর হাসিতে একটা শিশুসুলভ ব্যাপার আছে। বাদলের চুলগুলো কোঁকড়া, গায়ের রং শ্যামবর্ণ। চেহারা আকর্ষণীয়। হাসলে ওকে নিষ্পাপ দেখায়। আমার কৌতূহল বাড়ে বাদলের হাসিতে।

—কী কী জ্ঞান লাভ করলে?

—এই ধর, বাঙালি জাতি ভালো কিছু করে ঠিকই তবে এক সাথে করতে পারে না। যখনই ভালো কিছু হয় তখনই একটা চুলের আগা ফাটার মতো অনেকগুলো মুখ বাইর হয়। মানে খালি গ্রুপ করে। ত্রিমুখী-চর্তুর্মুখী ভালোতে দেশ ভাইসা যায় ঠিকই কিন্তু ততদিনে মনের ভেতর ঘুণে ধরে। অন্যের ভালোতে ভালো লাগে না তখন।

আমাদের কলেজের বাংলার সামাদ স্যার যেভাবে লালসালু পড়াতেন ঠিক সেই কায়দায় বাদল কথা বলতে থাকে। আমি চুপচাপ শুনি।

—মনে কর সেই সেলুনের দোকানের মতো। পুরানা দোকানী মার্কেটের জৌলুসহীন কোণে থাইকা পুরানা ক্ষুর দিয়া চুল কাটে আর আশেপাশের পার্লারের রং দেইখা মুচকি

হাসে। মনে মনে কয়, ভালো কইরা চুল কাট ব্যাটা, একদিন তোর ব্যবসা লাটে উঠবো। মনে কর, পুরানা সেলুনের দোকানের পাশে যে, তেল কসমেটিকসের দোকান বা চায়ের টঙও ভালো চলে সেইটা বাঙালির মাথায় থাকে না। মাথায় থাকে, রহিম সেলুনের দোকান দিয়া ভালো ব্যবসা করতেছে, আগে রহিমের ব্যবসা ডাউন দিমু, হেরপর নিজের ব্যবসার লাভ। মাঝখান দিয়ে পুরানা কাস্টমাররা রহিমের দোকানেই যায় আর করিমের পার্লারে পুরানা কাস্টমারের মইধ্যের ক্ষ্যাপা কয়জন যায়। লাভের মইধ্যে দুইটা লাভ হয়, রহিম-করিম চুল কাটে আর গীবত কইরা একজন আরেকজনের ভাইয়ের গোশত খায়, দ্বিতীয় লাভটা হইলো দুজনের ব্যবসাতেই শুধু টাইনাটুইনা পুঁজি ওঠে, কোনো লাভ আর ওঠে না।

'তা এত অভিজ্ঞতা নিয়ে কি সেলুনের দোকান দেবে?' আমার কটাক্ষ ধরতে পেরে বাদল হাসে।

—ধর দিলাম। তাও তো একটা নতুনত্ব আসলো জীবনে। মনে কর মামু তুই যে জীবনের ভিতর দিয়ে যাস, তুই কি মজা পাস?

আমি উত্তর দিই না। অথচ উত্তর আমার অজানা না। বাদলের প্রশ্ন শুনে নিজের সঙ্গে প্রতারণা করার অস্বস্তি এই প্রথমবারের মতো বুকের ভেতরে ঘাই মারে। নিজেকে সামলে নিয়ে আমি উল্টো ওকে প্রশ্ন করি, 'তুমি নিজে কি মজা পাও?'

—না পাই না। তাই তো আমি এট্টু মজা নেই মামু। ভোগবাদী জীবনের শেষটা দেখা হইয়া গেলে জীবনের প্রতি একটা নিরাসক্তি কাজ করে, তখনই আমি জীবনে নয়া ডাইমেনশন আনি।

এবার বাদল হাসে না। বাদলের মুখে ক্যাফের আলো আঁধারির রহস্যময় ছায়া। কেমন একটা রাগ হয় আমার, বলি, 'ইচ্ছা করে বৈচিত্র্য আনো?'

—হু, কোনো কিছুর এক পিঠ দেখা হইয়া গেলে আরেক পিঠ দেখতে মন চায়। এই ধর, বেশিরভাগ মানুষের জীবনটা কেমন? গড়পড়তা বেশিরভাগ মানুষ আমরা একটা ফ্যান্টাসিতে বাস করি, সমস্যা এভয়েড কইরা। মোদ্দাকথা আমরা ভোগবাদী। যতটুকু করলে আমাদের অস্তিত্বে আঘাত আসবো না, আমরা ঠিক ততটুকুই করি—এই শ্রেণির মানুষের জীবনে একটা সময়ে আর কিছু পাওয়ার থাকে কি? থাকে না। তখন তার সামনে দুইটা পথ খোলা থাকে।

বাদল থামে। মুখের হাসি বলে দিচ্ছে ওর এই স্বেচ্ছাবিরতি আমাকে কৌতূহলী করার জন্যই। আমিও জানতে চাই, 'কী কী পথ?'

—তখন মানুষ হয় চরম বিষণ্নতায় ভোগে, হয়তো ক্রমাগত আত্মহত্যার দিকে আগায় নয়তো জীবনের গতিপথ পাল্টায় ফেলে। ধর, নতুন নতুন ডাইমেনশন আনে। তার যা খুশি তাই করে।

—সব পেয়ে গেলে মানুষ যা মন চায় তা করবে? তার পরিবার আছে না?

—থাকুক। সুখের সব গন্তব্য জানা হইয়া গেলে জীবনের ভোগবাদিতা অসহ্য লাগে মামু।

—জীবনের ভোগবাদিতা অস্বীকার করে তুমি যা খুশি করতে পারবে? মৌলিক চাহিদাগুলো তোমাকে ছাড় দিবে কি?

—দোস্ত যা খুশি তা তো করতেই পারি। এই ধর, অফিস-ব্যবসা বাদ দিয়া শহীদ মিনারে শুইয়া থাকি। যারা দল বাইন্দা অনশন করে, ব্যালিকরে মাঝে মইধ্যে তাদের সাথে প্রথম সারিতে বুক চিতায় দাঁড়ায় থাকি। একটা দুটা ককটেল ফুটলে কইষা দৌড় মারি, পুলিশের গরম পানি খাই।

—তুমি সত্যি এসব কর?

—করি দোস্ত। কোনো কিছুই যখন এই জীবনদর্শনের সাথে খাপ খায় না, তখন মাঝে মইধ্যে অমন কিছু করি। আজকাল মন চায় একটা পরকীয়া করি, তাহেরা রে কান্দাই। হাহাহা।

বাদলের মুখ ঝলমল করছে। মুহূর্তের জন্য আমার মনে হয় ও স্বভাবসুলভ রসিকতা করছে। কিন্তু ওর মুখ সে কথা বলছে না। বাদল যা বলছে ঠান্ডা মাথায় বলছে।

'তার মানে তুমি বলছো, এই জীবনে তোমার সব পাওয়া হয়ে গেছে? দুটি সন্তান, গৃহিনী, পরিপাটি গৃহগল্পে এখন তোমার কোনো নতুন চাহিদা নেই? বৈচিত্র্য নেই? কিন্তু মানুষের কি চাহিদার শেষ আছে? না চাহিদাপূরণে পরিতৃপ্তি আছে? এখন তোমার পরকীয়া করা লাগবে? নাকি অলরেডি করছো?' আমার গলায় কটাক্ষের সুর বাদল টের পায় কি পায় না আমি তা বুঝতে পারি না। ও মৃদু হাসে।

—সিদ্ধান্ত নিই নাই। ভাবতেছি।

—এসব ভাবনা বাদ দাও।

—বাদ বললেই বাদ দেয়া যায়? নতুন ডাইমেনশনে জীবনের পথ ঘোরাতে হইব। নয়তো বাঁইচা থাকার মানে কী? প্রথম পথ বিষণ্নতায় হাঁটতে পারুম না।

—অবশ্য তোমাকে বুঝিয়ে কী হবে। নিজের মত ছাড়া কারো মত তো তোমার দর্শন হয় না।

—ঠিক চিনছো দোস্ত আমারে। এই যে জীবন দর্শন বিষয়টাই একান্ত নিজস্ব। নিজে যে পথে হাঁটবা সেটাই তোমার দর্শন। সেই দর্শনকে নিজে নিয়ন্ত্রণ করতে পারার মজা না বুঝলে মানুষ কীসের মানুষ!

বাদলের কথাগুলো গালগপ্পো বলে আমি উড়িয়ে দিতে গিয়েও পারি না। আমার কাছে ফুটানি মেরে নিজে বড় হবার ছেলে সে না। এই বাদল সেই মানুষ যে বন্ধুর জন্য সাইকেল চুরির অপবাদে হাজতবাস করছে, এ সেই বাদল যে বন্ধুর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রেমিকের হাতে ক্ষুরের পোঁচ দিয়েছে, ক্লাসে বন্ধুর অপকর্ম ঢাকতে বন্ধুর নাম না বলে নিজে মার খেতে স্যারের সামনে হাত পেতে দিয়েছে। কফিশপের মায়াবী আলো আমাকে স্মৃতিকাতর করে তোলে। স্কুল-কলেজের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে।

আড্ডার ঝড় স্তিমিত এখন। আমি নীরবতা ভাঙি।

—মনে আছে তোমার? ফার্স্ট ইয়ারে নবার হাতের তালুতে সিগারেটের ছ্যাঁকা দিয়েছিলে?

—হাহাহা। খুব মনে আছে। নবা শালাটা এখনও হারামি। সেদিন মার্কেটে দেখা, দেখি শালা তাহেরার বুকের দিকে তাকায় আছে। মন চাইল হারামিটার হাতে আবার ছ্যাঁকা দিই।

আমি হাসি। এই মানুষই খানিক আগে পরকীয়ার বাসনার কথা বললো! বাদলও তাহলে হিপোক্রেসি করে! সব মানুষই আদতে দ্বিমুখী সত্তা ধারণ করে। পরিস্থিতি অনুযায়ী তার বিপরীতমুখী ভাবনার খোঁজ মেলে। আমাকে হাসতে দেখে বাদল এই প্রথমবারের মতো অবাক হয়।

—হাসছিস ক্যান মাসুদ?

—তোমার দ্বৈত চরিত্র দেখে। তুমি না পরকীয়া করবে? তা তোমার বউয়ের দিকে কেউ তাকালে তাকে ছ্যাঁকা দেবে—ক্যামনে কী বন্ধু?

—আরে দুরো...তুই ভালো কইরাই জানোস, তাহেরার জায়গায় অন্য কোনো মেয়ে থাকলেও আমি একই কথাই বলতাম।

ক্ষণিকের জন্য বিস্মৃতিতে আটকে থাকা আমার মনে পড়ে বাদল সত্যিই তাই। ওর ভেতরে দ্বৈত স্বত্ত্বা নেই। আর আমি? আমি কী? নিজেকে খুঁজতে খুঁজতে বাদলের কথার পিঠে কথা খুঁজে পাই না। বাদল বলে যায়, কত কথা, কী করবে, কী করবে না। বাদলের চোখের মার্বেল ঝকঝক করে। এই চোখে জীবনকে কতভাবেই না দেখা যায়!

বাদল আর আমার সুখ ও প্রাপ্তি বিষয়ক আড্ডার রেশটুকু সঙ্গে নিয়ে একসময় আমি কফিশপ থেকে বের হয়ে যাই। বাড়ি ফেরার পথে নিজের ভেতরে বারবার একটা প্রশ্নই ঘুরপাক খেতে থাকে, বাদলকে আমি ঈর্ষা করি নাকি সমীহ করি বাদলের জীবনবোধ?

এর ঠিক তিন মাস পরে রাহাতের কাছ থেকে বাদলের মৃত্যুসংবাদ জানতে পারি। জানতে পারি বাদল আত্মহত্যা করেছে।

(রচনাকাল: ২০১৭, গল্প সংকলন: মেনকি ফান্দার অপরাধ কিংবা পাপ)

আহুতি

১

আমাদের ঘরে কখনো সকাল আসে না। এখানে সময় স্থির, স্তব্ধ। ভৌতিক আঁধারে দিনরাত্রির হিসাব ভুলে আমরা এই ঘরে নিশ্চল বসে থাকি। থেকে থেকে ঝিঁঝিঁ পোকা, ব্যাঙের ডাক শুনতে পেয়ে অন্ধকারের ঘনত্ব, লোকালয়ের দূরত্ব পরিমাপ করার চেষ্টা করি। কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঝিঁঝিঁ পোকার নিরবচ্ছিন্ন শব্দ ভেদ করে জিপের চাকার ভয়ালো শব্দ জোরালো হতে থাকলে আমাদের বুকে তোলপাড় ভয় জাগে। আমরা দরজার চৌকাঠের ফাঁক দিয়ে দেখি বাইরে আলোর লাল আভা জ্বলে-নেভে। বুটের ধুপধাপ শব্দ, জন্তু-জানোয়ারের হিংস্রহাসির সঙ্গে বিজাতীয় ভাষার কথোপকথনের শব্দ ভেসে আসে। আমরা নিজেদের কণ্ঠনালী চেপে চুপচাপ শুয়ে থাকি। কোনো কোনো সময়ে চারপাশে এত গাঢ় অন্ধকার ঘনিয়ে আসে যে দেখে মনে হয় আমরা কবরে চাপা পড়েছি। কবরের মতো নিস্তব্ধ এই ঘরে আমাদের সময় আটকে গেছে, আমরা আলোর প্রতীক্ষায় থেকে থেকে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, যেই ক্লান্তি আমাদের স্বপ্নগুলো গলা টিপে মেরে ফেলছে।

আমাদের এই স্যাঁতস্যাঁতে সবুজ চার দেয়ালের ঘরে আলো আসে আচমকা। এই ঘরে একটি মাত্র জানালা। জানালাটি বন্ধ থাকে সারাদিন। আমাদের জীবনের স্পন্দন তবু ওই জানালার কপাটে লেপ্টে থাকে। সকালে জমাদারনি এলে এই জানালার কল্যাণেই আমরা আলোর দেখা পাই। খয়ের-জর্দা দেয়া পানের ঝাঁঝালো গন্ধ ছড়াতে ছড়াতে সে ঘরের মেঝে ঝাড়ু দেয় আর আমাদের গালিগালাজ করে। জমাদারনির মুখের উৎকট গন্ধে আমরা কিছু মনে করি না, তার বাক্যবিষে নীলও হই না। আমাদের শরীর শত শত

আঘাতে শত শত বছর আগে থেকেই নীলবর্ণ। আমরা কেবল অপেক্ষায় থাকি জমাদারনি কখন জানালাটি খুলবে।

একসময় জমাদারনি জানালাটি খোলে। কাঠের পাল্লা দুটি খুলে যেতেই জানালার শিকগুলো আলোর চাপে ভেঙে যায়। আমরা তৃষ্ণার্তের মতো সেদিকে ছুটে যাই। আলোর ভাগাভাগি করতে করতে উন্মত্ত হয়ে উঠি। হুড়োহুড়ি, গলাগলি করে একে ওকে ঠেলতে ঠেলতে খিলখিল করি। আমাদের উন্মাদনা দেখে জমাদারনি ঘরের কোণে পানের পিক ফেলতে ফেলতে চিৎকার করে ওঠে, 'বেবুশ্যে মাগিরা।' আমরা তার উচ্চারিত অনাকাঙ্ক্ষিতকোনো শব্দ কানে তুলি না। আমরা মুঠো ভরে আলো তুলি। খোলা জানালায় চোখ রেখে আকাশের আলোর ক্ষরণ দেখতে গিয়ে আমরা কত কী দেখি—বিস্তীর্ণ মাঠ, সবুজ পাতার সামিয়ানা, পথের বাঁক, আলোর ঘোর, মুক্ত বাতাস, লাল-সবুজের ক্লান্তিহীন ঢেউ।

জমাদারনি বেশিক্ষণ জানালাটি খোলা রাখে না। ঘরের দূষিত হাওয়া বাইরে উড়িয়ে নিতে যতক্ষণ সময় লাগে কেবল ততক্ষণ আমরা আলোর দেখা পাই। আলোর নৈঃশব্দ্যের মুহূর্তটুকু আমাদের কাছে কলরব হয়ে বেজে ওঠে। একসময় যেমন দুম করে জানালাটি খুলেছিল তেমন দুম করে জানালাটি বন্ধ করে জমাদারনি আবর্জনার বালতি টানে আর গালমন্দ করতে করতে চাপা কণ্ঠে জানায়, পাপ থেকে আমাদের মুক্তি নেই। থপথপ পায়ে সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। যাওয়ার সময় সঙ্গে করে নিয়ে যায় জর্দা আর আলোর ঘ্রাণ। এরপর ঘরের ভেতর ঢোকে অনেক মানুষ। একজন দুজন, তিনজন, সাতজন। বহু জন।

এই ঘরে একটি মাত্র জানালা। দরজা দুটি। যেই দরজা দুটি দিয়ে বহু মানুষ একসঙ্গে ঢোকা যায়। কিন্তু বের হওয়া যায় না।

২

আমি কেন, কখন জিপ থেকে লাফ দিয়েছি, মনে নেই। মুখ থুবড়ে পড়ার ঠিক আগ মুহূর্তের কথা কেবল মনে আছে। জিপের পেছনের খোলা দিক দিয়ে ভুরভুর করে বাতাস আসছিল। চাঁপা ফুলের মতো তুলতুলে নরম বাতাস। বাতাসের ঘ্রাণে ভাসছিল সরিষা ফুলের রেণু। মন চাইছিল বুক ভরে ঐ বাতাস টেনে নিই। লোভীর মতো সবটুকু আলো কেড়ে নিয়ে নিজের নোংরা শরীরে মাখি।

দিন পনেরো আগে ওদের বড় অফিসারের কাছে ভেট পাঠানোর পূর্বপ্রস্তুতি হিসাবে ওরা আমাকে এক বালতি পানি দিয়েছিল। অনেকদিন পর সেদিন মাথার জটাধরা চুলের আড়াল খুবলে উকুন আনতে আনতে সুগন্ধি সাবান দিয়ে গোসল করেছিলাম। ছোটবেলায় মা যেমন করে আমাকে ঘষে ঘষে গোসল করাতো, বালতির আধময়লা পানি দিয়ে তেমনি নিজের ঘাড়, গলা, মুখ ঘষেছিলাম। গোসল শেষ হলে সেদিন প্রথম ওরা আমাদের কয়েকজনকে নতুন কাপড় দিয়েছিল। যদিও রাতে আবার সেই কাপড় খুলে নিয়েছিল। জমাদারনির কাছে শুনেছিলাম, এই ঘরে একটা মেয়ে নিজের শাড়ি গলায় দিয়ে ফ্যানে ঝুলে পড়েছিল। মাঝরাতে ঘুমের ঘোরে সিলিংয়ের দিকে চোখ গেলে আমি অজ্ঞাতকুলশীল ঝুলন্ত মেয়েটিকে দেখতে পাই। আধময়লা পেটিকোট আর ব্লাউজ পরিহিত অবস্থায় সিলিংফ্যানের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমি সেই মেয়েটিকে ভীষণভাবে ঈর্ষা করি!

আমিসহ আরো পাঁচজনের সৌভাগ্য দেখে আমাদের ঘরের কেউ কেউ আজ ঈর্ষাকাতর হয়েছে। আজ আমি বাইরে এসেছি। সকালে যখন বাইরে বের হয়েছি তখন আলোর দিকে তাকাতে পারছিলাম না। অনভ্যাসে চোখ কুঁচকে যাচ্ছিল। বাকি পাঁচজনেরও তখন একই অবস্থা ছিল। আলো সয়ে এলে আমি লোভীর মতো জিপের পেছনদিকে তাকিয়ে ছিলাম। জিপ তখন ছুটছে। মাটির রাস্তার থৈ থৈ তালে আমার কানের পাশে নাক গুঁজে কেউ কিছু একটা বলেছে। এই ভাষা চেনা। বাকিরা হাসছে। এই হাসির শব্দ চেনা। আমার আশেপাশের সবাই এভাবে হাসে। যখন ইচ্ছা তখন।

আমি হাসি না। কাঁদি। যখন ইচ্ছা তখন। কাঁদি বলে মার খাই তবু কাঁদি। ওদের অনেকেই আমার মতো কাঁদে। কেউ কাঁদে স্বামী-সন্তান, মা-বাবার কবরের জন্য, কেউ বা ফেলে আসা উঠান, ঘরদোর, কদমতলা, তুলসীবেদীর মায়ায়। কারো কারো চোখে এক বিন্দুও পানি থাকে না, থাকে আগুনতাপ। বিশেষ করে যশোরের ইরা নামের মেয়েটি যখন

শ্যেনদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তখন গনগনে তাপে ওর ফর্সা মুখ টকটকে লাল হয়ে যায়। দেখে আমি ভীষণ ভয় পাই। ইরা বলে, ওই শুয়োরগুলোর মুখে থুতু মারবে। দুর্বিনীত ইরার কথা শুনে আমার বুকের ভেতরে ঢংঢং করে বিপদঘণ্টাবাজে।

জিপের একেবারে বাম কোনায় বসা মেয়েটি ইরার ঠিক উল্টো। ও কখনো হাসেনি, কাঁদেনি, ক্ষেপেও ওঠেনি। মেয়েটি সবসময় বোবাদৃষ্টিতে সামনে তাকিয়ে থাকে। এই এক মাসের মধ্যে মাত্র একবার কী দুবার কথা বলতে শুনেছি ওকে। ওর বুকের মানিককে ভাতের গরম হাঁড়িতে ছুড়ে ফেলেছিল পাকজন্তুরা। স্বামীর সামনে বিবস্ত্র করে টানতে টানতে ওকে তুলেছিল জলপাই রংয়ের জিপে।

আজ বাইরে যাবার ডাক পড়তেই, মেয়েটি আরও নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। আমাদের ভেতরে কারো বাইরে যাবার ডাক পড়লে আমরাও এমন নিস্তব্ধ হয়ে যাই, কেউ কেউ খুশিও হই। অনেকেই এমন করে বাইরে এসেছে আর ফিরে আসেনি। যারা ফিরে আসেনি তাদের আমি বা আমরা ঈর্ষা করি।

জিপটা কী কারণে যেন থেমেছে। ওদের কেউ একজন শিস বাজাতে বাজাতে ভারি পায়ে এগিয়ে গেছে ঝোপের দিকে। আমি পথের ধারের বকফুল, বাবলা, খয়ের, চম্পার আড়াল দেখছি। ঠিক তখনই জলাটা চোখে পড়েছে। জলার ধারে মোচড়ানো শরীরের একটা পিটালি গাছ দাঁড়িয়ে আছে। হলুদ হলুদ ফুলের লম্বা মঞ্জুরি মুখ বাড়িয়েছে পানিতে। জলার পানি টলমল করছে। বাতাস পানিতে ফুঁ দিয়ে দিয়ে ঢেউ তুলছে। কতদিন এমন টলটলে পানি দেখিনি আমি! আমি ছুটে গিয়ে জলার পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছি। কী ঠান্ডা পানি! সেই পানিতে নেমে আমার শরীর জুড়িয়ে গেছে, মুছে গেছে সকল গ্লানি। পরে শুনেছি, জিপ থেকে লাফিয়ে মাটিতে পড়েছিলাম। সেদিনই ক্যাম্প বদলেছিল আমার।

এখন আমি যে ঘরে থাকি সেই ঘরেও একটি জানালা। দরজা দুটি। যেই দরজা দুটি দিয়ে বহু মানুষ একসঙ্গে ঢোকা যায়। কিন্তু বের হওয়া যায় না।

মেয়েটি কখনো আল্লাহকে ডাকছে, কখনো ভগবানকে। প্রথমদিন আমরা কারণ জানতে চেয়েছিলাম। ও ভয়ার্ত চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'কোন ডাকে তিনি খুশি হবেন ঠিক বুঝতে পারছি না।' তিনি খুশি হলে কী হবে এই প্রশ্ন করতে করতে আমাদের কেউ কেউ হেসেছে। লম্বা চুলের শান্তমতো মেয়েটি সবচেয়ে কম হাসে, কাঁদে বেশি। বেশি কাঁদে বলে মারও খায় সবার চেয়ে বেশি। ওর নাম সোনালি। ঘরের পশ্চিমকোণে মেঝেতে সোনালি ঘুমাচ্ছে। ওর শরীরে জ্বর। এই ঘরে জ্বর বা ব্যথা পরিমাপের পারদ নেই। গতকাল রাতে সোনালির চুলের মুঠি ধরে একজন সৈনিক এমনভাবে টেনেছিল যে ওর এক গাছি চুল হাতে উঠে এসেছে। মেঝেতে এখনো সেই চুলের গোছা পড়ে আছে।

সোনালি কাল ব্যথায় চিৎকার করে মা মা বলে কাঁদছিল, তখন সৈনিকটি ওর ডান স্তনে হ্যাঁচকা টান মেরে বিকৃত স্বরে চেঁচিয়ে উঠেছিল, 'খানকি, খানকি।' সৈনিকটি অবিকল বাঙালিদের গলায় অশ্রাব্য গালিগালাজ করছিল। ওর সঙ্গে একজন বাঙালিও ছিল। গতকাল মিলিটারিদের উচ্ছিষ্ট পাতে তুলতে এসে ওরা সবাইকে নিয়ে টানাটানি করছিল। এই ঘরের নতুন সদস্য আলপনাকে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়েছিল। যাওয়ার সময় সোনালিকে কাঁদতে দেখে ওকে ইচ্ছামতো চড়-থাপ্পড় মেরেছিল।

রাতের খাবার খায়নি সোনালি। বেশ কয়েকবার বমি করেছিল। টিনের থালায় রাখা থকথকে সবজির ওপর বমির তরল দেখে সকালেও রেগে উঠেছিল ওরা। থালার ওপরে সোনালির মুখ ঠেসে ধরেছিল। উল্লাস করতে করতে শায়ের আওড়াচ্ছিল। এদের আনন্দ দেখলে আমরা নিজেদের মৃত্যুকামনা করতে থাকি। যে কোনো মুহূর্তেই মরে যাবার জন্য প্রস্তুত আমি বা আমরা। কিন্তু ওরা আমাদের মারে না। মাঝেমাঝে জায়গা বদল করে শুধু। এখানে এসেছি অনেকদিন হয়ে গেল। শহরতলির এই দিকটা খুব নিরিবিলি। মাঝেমাঝে বাইরে গোলাগুলির শব্দ শোনা যায়, জিপের চাকার যান্ত্রিক শব্দের সঙ্গে পশুদের জান্তব চিৎকার কানকে বিবশ করে তোলে।

সৈনিকদের কথোপকথন থেকে আমরা জানতে পারি, আজ ব্লাকআউটের রাত। পথে-ঘাটে, ঘরে-বাইরে অন্ধকার থরে থরে সাজানো। এক পা বাইরে ফেললেই নিশ্চিত মৃত্যু। মৃত্যু আমরা দেখেছি, নতুন করে মৃত্যুকে চেনার কিছু নেই। আমরা তাই নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বসে এর ওর সঙ্গে গল্প করি, দুআঙুলের নখের চাপে চটচট শব্দে উকুন পিষতে পিষতে

হালকা রসিকতা করি, অন্ধকারে আলোর নিশানা খুঁজে আন্দাজ করি সময়ের নিষ্প্রাণ গতিবেগ।

আমাদের ঘরের চার দেয়ালে কালো অন্ধকার রাত চিরকালের জন্য থমকে গেছে, ঘরের দেয়ালেও সময় ঝুলানো নেই। যদিও কয়েকদিন ধরে ঘরের বদ্ধ বাতাসে ঠান্ডার ভাব দেখে বোঝা যায়, শীত আসছে। আমাদের মধ্যে সবচেয়ে পৌঢ় মুখ শিখাদি দিনক্ষণ হিসাব করে বলেছে, এখন কার্তিক মাস। শিখাদির কণ্ঠস্বর খুব সুন্দর। কদিন ধরে দিদি গুনগুন করছে,

'কার্তিক ঠাকুর হ্যাংলা,

একবার আসেন মায়ের সাথে,

একবার আসেন একলা।'

শিখাদির গুনগুনানি আমাদের মস্তিষ্কের কোণে কোণে আনন্দ ছড়াচ্ছে। শিখাদি এখন বুকের ওপর দুহাত জড়ো করে দাঁড়িয়ে আছে। আধন্যাংটো শরীরে তাকে বুকের ওপর এমন ক্রসবেল্টের ভঙ্গিতে দুহাত রাখতে দেখে এখন আর আমাদের হাসি পায় না।

অন্যসময় হলে আমরা হাসতাম। আজ আমাদের ঠোঁটে ব্যথা। কারো কারো স্তনে, নিতম্বে, উরুসন্ধিতে, যোনিপথে ব্যথা। গতকাল কোনো কোনো শরীরে ওদের ঢুকতে দেরি হচ্ছিল বলে ওরা আমাদের শরীর কামড়ে মাংস খুবলে নিয়েছে। আমরা ওদের চিনি না। শরীরের খাকি পোশাক ছুড়ে ফেলতে ফেলতে ওরা যখন আমাদের ভোগ করতে থাকে তখন ওদের মুখগুলো আমাদের একইরকম লাগে। এই সৈনিকটিও একই চেহারার। সৈনিকটি এগিয়ে আসছে। আমরা সতর্ক চোখে তাকাই। এখন কার পালা জানি না। একজন ফিসফিস করে, 'ওরে নিয়া যাইব আইজ।'

সৈনিকটি ঘুমন্ত সোনালির নিতম্বে লাথি মারছে। বুটের সেই শব্দ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে ঘরের চার দেয়ালে। সোনালি দুমড়ানো শরীরে উঠে দাঁড়ায়। আমরা চমকে তাকাই।

আমরা টের পাই, সোনালি আর ফিরবে না। সোনালির গর্ভের শিশুটিও ফিরবে না আর এই ঘরে। যে ঘরে একটি জানালা। দরজা দুটি। যেই দরজা দুটি দিয়ে বহু মানুষ একসঙ্গে ঢোকা যায়। কিন্তু বের হওয়া যায় না।

৪

সাপের ফণা তুলে এক একটি পুরুষাঙ্গ আমার দিকে এগিয়ে আসতে থাকে আর আমি বেদনার ভারে নীল হতে থাকি। একসময় ওরা চলে গেলে রাশি রাশি অভিমান ধেয়ে আসতে থাকে আমার দিকে। বদ্ধ ঘরে গাঢ় অভিমানের মতন অন্ধকার আরো জমাট হয়। সেই আঁধারে আমার আশেপাশের পরিত্যক্ত শরীরগুলো যখন ঘুমে কিংবা জাগরণে কাতরাতে থাকে তখন আমি জেগে জেগে মাকে স্বপ্নে দেখি। দীর্ঘ পাঁচ মাসের বকেয়া ঘুম মায়ের বুকে মাথা রেখে ঘুমাবো ভেবে অপলক তাকিয়ে থাকি।

মা আমাকে মাটির নিচে গর্ত খুঁড়ে লুকিয়ে রেখেছিল। দাদার তৈরি 'স্বপ্ন মঞ্জিল'র স্বপ্ন সংগোপনে পুঁতে রেখেছিল বাগানের শিমুল গাছের পাশে। কিন্তু রক্তবর্ণ ফুলের চাদর আমাকে আড়াল করে রাখতে পারেনি। সেদিন আমাদের বাড়ির পাশের বিহারিপাড়া থেকে মুহূর্মুহূভেসে আসা শ্লোগানে মা ভয় পেয়েছিল খুব। মা আমাকে ইশারা করতেই আমি শিমুল তলায় ছুটে গিয়েছিলাম।

দিনের ঝকঝকে আলোতে সেদিন যান্ত্রিক বাহনে করে পাকজন্তুরা রাস্তায় নেমেছিল। ওদের সঙ্গী হয়েছিল কিছু বাঙালি আর উর্দুভাষী বিহারি। গোটা দেশ তখন লাশে ডুবে গেছে। রাস্তার ধারে, পুকুরপাড়ে সারি সারি লাশ পড়ে ছিল। ঘাঘট নদীর পানি লাল বর্ণ হয়ে গিয়েছিল। নদীর ধারে মুখ থুবড়ে পড়ে ছিল বেয়োনেটে খোঁচানো, গুলিবিদ্ধ সব লাশ। যেসব লাশের শেষকৃত্য হয়নি। শহরের এসব খবর শুনেশুনে মা আমাকে গর্তে ঢোকার পরও নিজের বুকের ভেতরে লুকিয়ে রাখতো। মায়ের শরীরের ঘাম আর মসলার গন্ধ আমার চোখে-নাকে মাখামাখি হয়ে থাকতো।

মায়ের সোনা মেয়ে আমি। সোনার মতো বরণ। শহরের ছিপছিপে পথে যে সোনা রং ঝলমল করতো রোদের সামান্য পরশ পেয়ে। মা তার হাতের অনন্তবালা জোড়া মেয়ের নাম করে তুলে রেখেছিল। আমি বিয়ের দিনে রাজরানি সেজে বসে থাকবো সেই সুখের কথা ভেবে মায়ের ঘুম হতো না। আর মা এখন কী নিশ্চিন্তেই না ঘুমিয়ে আছে।

ওরা যখন আমাকে হিড়হিড় করে টেনে গর্ত থেকে বের করে নিয়ে এসেছিল তখন মা চিৎকার করে উঠেছিল, 'আমাদের মেরে ফেলো, মেরে ফেলো...।' ওরা মাকে মেরে

ফেলেছিল, আমাকে মেরে ফেলেছিল।

আমি আমার শবদেহ নিয়ে মেঝেতে শুয়ে আছি। এই ঘরের বাইরেও অনেক শবদেহ শুয়ে আছে।

আজও জানালা খোলার সঙ্গে সঙ্গে আমি আলোর দিকে হামলে পড়েছিলাম। তাপে আমার চোখ পুড়ে যাচ্ছিল। দগ্ধ চোখে বাইরে তাকিয়ে মাঠে পড়ে থাকা বেয়োনেটে খণ্ডিত পাঁচটি লাশ দেখছিলাম। ক্রুশবিদ্ধ যিশুর মতো একটি লাশ গাঁথা ছিল জানালার ওপাশের মেহগনি গাছের কাণ্ডে। লাশটির পরিচয় আমি জানতাম না। কিন্তু লাশটি ওপড়ানো চোখেও আমার দিকে তাকিয়ে ছিল, দেখে মনে হচ্ছিল আমি ওর কত দিনের চেনা। আমি ভয়ে জানালার সামনে থেকে সরে এসেছিলাম।

তখন সময় কত হবে জানি না। জমাদারনি প্রতিদিনের মতো জানালা বন্ধ করে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই একটা শুয়োর এসে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে আমাকে পাশের ঘরে টেনে নিয়েছিল। আমাকে নগ্ন করার জন্য হাত বাড়াতেই আমার ওপর ইরা ভর করেছিল। সারাদিন ধরে মুখে জমিয়ে রাখা থুতু আমি প্রচণ্ড আক্রোশে শুয়োরটার মুখে ছুঁড়ে মেরেছিলাম। দিশেহারা হয়ে দাঁতাল শুয়োরটা দুহাত বেঁধে রেখে আমার মুখে প্রস্রাব করেছে।

ভেবেছিলাম আমাকে মেরে ফেলবে। যেভাবে ইরাকে মেরেছে—ওর স্তনজোড়া, নিতম্ব, যোনিটুকরো টুকরো করে কেটেছে সেভাবে খণ্ডখণ্ডকরবে আমাকে। কিন্তু না, ওরা আমার জন্য বেঁচে থাকার মতো কঠিন শাস্তি নির্ধারণ করেছিল। উলঙ্গ আমাকে টানতে টানতে ঘরের কোণে ছুঁড়ে ফেলেছিল। আমি নরকযন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে বারবার নিজের গলা চেপে ধরেছি। আমাকে ব্যথাতুর চোখে দেখতে দেখতে গতকাল আসা নতুন মেয়েটি থরথরিয়ে কেঁপেছে আর জানতে চেয়েছে, ‘আমরা কি কোনোদিনও এখান থেকে বের হতে পারবো না?’ মেয়েটির পাখি কণ্ঠস্বর ঘরের অতলস্পর্শী গিরিখাতে তলিয়ে গেছে।

মেয়েটি জানে না, এই ঘরে একটি জানালা। দরজা দুটি। যেই দরজা দুটি দিয়ে বহু মানুষ একসঙ্গে ঢোকা যায়। কিন্তু বের হওয়া যায় না।

৫

যেদিন শেষবারের মতো আমরা আমাদের কবরখানায় মৃত্যুর বিষপাত্র হাতে শুয়ে আছি সেদিন আমাদের অবাক করে এই ঘরের একমাত্র জানালাটি খুলে যায়। বন্ধ দরজা দুটিও উদার হাতে খুলে দেয় কেউ। দেখতে দেখতে অন্ধকার ঘরটি ভেসে যায় আলোর স্রোতে। সময়ের বিপন্ন পুলসিরাত পার হয়ে দীর্ঘ নয় মাস পরে আমাদের ঘরের ভেতরে পায়রার অজস্র নরম পালক ঢুকে পড়ে। সেই পালকে ভর করে অপূর্ব এক নবীন সকাল আসে।

যে সকাল আমরা কখনো দেখিনি। আমাদের শৈশবে না, কৈশোরে না, তারুণ্যে না, পৌঢ়ত্বেও না। ঝলমলে এই সকালের ডাবের শাস রংয়ের আকাশ মেঘশূন্য। চারদিকে অফুরান আলোর খেলা। আমাদের ঘিরে থাকা বাতাসে রক্ত আর এলাচের ঘ্রাণ মাখামাখি করে থাকে। যেই ঘ্রাণ আমাদের ক্ষতবিক্ষত শরীরে আনন্দের তীব্রতা ছড়িয়ে দেয়, আর সেই ঘ্রাণে বুঁদ হয়ে আমরা খোলা দরজা-জানালা দিয়ে মুক্ত দেশের মুক্ত আলো দেখতে থাকি।

(রচনাকাল: ২০১৯, গল্প সংকলন: মেনকি ফান্দার অপরাধ কিংবা পাপ)

ঋণ: নীলিমা ইব্রাহিমের ‘আমি বীরাঙ্গনা বলছি’ এবং গেরিলা ১৯৭১

ডুবসাঁতার

আজ আমার মোনালিসা আপার সঙ্গে দেখা হবে। তিন বছর আট মাস ছয় দিন পর। মোনালিসা আপা, আমাদের মোনা আপা। যার কাছ থেকে আমি পালাতে চেয়েও ধরা দিয়েছি বারবার। কী করে মোনালিসা আপার মুখোমুখি হবো ভেবে রাতের পর রাত নির্ঘুম থেকেছি, দিনের আলোতেও লুকোচুরি খেলেছি নিজের সঙ্গে।

গতকাল রাতে আমি একদম ঘুমাতে পারিনি। সারারাত বিছানায় শুয়ে ছটফট করেছি। রহস্যময় বাতিঘরের চূড়ায় বসে আবছায়াতে সমুদ্রজলের ওঠানামা দেখেছি। জলের বিস্তার সিঁড়ি হয়ে আমাকে অচেনা গন্তব্যে নিয়ে গেছে। নীল জলের সিঁড়ি ভেঙে আমি এক বিস্তীর্ণ বালুচরে পৌঁছেছি, ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখেছি হাওয়ায় লেগে থাকা নীল চুম্বনের দাগ। একটা ডিঙি নৌকা ঢেউয়ের তালে দুলতে দুলতে পাড়ে এসেছে। আমাকে ফিরিয়ে নেবে ভেবে নৌকাতে যেই পা রেখেছি, পা হড়কে তলিয়ে গেছি অতল জলে। ডুবতে ডুবতে ফের ভেসে উঠেছি। ঘুমের আবেশে রাশেদ গড়িয়ে পড়েছে আমার শরীরে, ওর আঙুলেরা বারবার আমাকে আলিঙ্গনে টেনেছে। সাড়া না পেয়ে পাশ ফিরে শুয়ে রাশেদ বেঘোরে ঘুমিয়েছে। আর আমি হৃদপিণ্ডের তোলপাড় করা ঢেউয়ের মাঝে দুলে দুলে ঘুমানোর ব্যর্থ চেষ্টা করেছি।

আজ ছুটির দিন। রাশেদের অফিসে যাওয়ার তাড়া নেই, আমারও চটজলদি নাস্তা বানানোর তাগিদ নেই। অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়ে রাতের ঘুমটুকু তাই পুষিয়ে নেবো ভেবেছিলাম। আরাধ্য ঘুম আসেনি। মোনালিসা আপার মুখোমুখি হবো বলেই হয়তো নিজের ভেতরে এত উৎকণ্ঠা কাজ করেছে আমার। রুপালি রাঙতায় মোড়ানো স্মৃতিবাকসো খুলে যাবার উত্তেজনার শিহরণ আমাকে এক ফোঁটা ঘুমাতে দেয়নি। বহুদিন পর বুকের গোপন সিন্দুকটা খুলে দেখবো ভেবে নির্ঘুম রাত কাটিয়েও উতল আমি

কাকভোরে বিছানা ছেড়েছি। চারদিকের থমথমে ভাব সরে গিয়ে সকাল সকাল মেঘ ছাড়াই উথাল-পাতাল ঝড় হয়েছে। বিনা নোটিশে খুব গোপনে কেউ এসে বুকের ভেতরটা জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে রেখে গেছে। আগুনহীন সেই দহনে পুড়তে পুড়তে আমি আমূল ভিজে গেছি। ভেজা শরীরে কাঁপতে কাঁপতে বিছানায় ফিরে গেছি। ঘুমানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। ঘুম আসেনি। ঘুমের বদলে কেউ এসে খুব যতনে বুকের ঠিক মাঝখানে টুকটুক...টুকটুক করে পেরেক গেঁথেছে, কানের কাছে ঢিমাতালে তারাপদ রায়ের কবিতা আবৃত্তি করেছে,

বছরের পর বছর, দিনের পর দিন
গ্রীষ্ম নেই, বর্ষা নেই, শুধু শীত আর শীতের হাওয়া
ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন, স্বপ্নের মধ্যে অভিমান
শীতল অভিমানে জড়ানো ঠান্ডা হাওয়ায় ঝরা পাতা
এলোমেলো ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশে রোদের উজ্জ্বলতায়।
তুমি উদাসীন চলে গেছো
কোনোদিন তাকিয়ে দেখোনি,
তুমি কোনোদিন শুনলে না
আমার ডুগডুগি, আমার বাঁদরনাচের বাজনা।

সেই মুহূর্তে মেসেঞ্জারে মোনালিসা আপার মেসেজ এসেছে, ‘আমি এসেছি। তুই চলে আয়। আজ দুপুরে আমার এখানে খাবি।’

উৎকণ্ঠিত রাশেদকে আশ্বস্ত করে আমি একাই বাসা থেকে বের হয়েছি। ও প্রথমে আমাকে একা ছাড়তে চায়নি। কিন্তু মোনালিসা আপার সঙ্গে দেখা হবার ক্ষণটিতে আমি সামান্য গোপনীয়তার আয়োজন রাখতে চেয়েছি। যদিও উৎকণ্ঠায় সারাক্ষণ আমার বুকের ভেতরে চকমকি পাথরের ঠোকাঠোকি হচ্ছে। আমি রাশেদকে বুঝতে দিইনি।

রাশেদ মানুষ হিসাবে মোটামুটি সহজবোধ্য। একেবারে আটপৌরে সংসারী মানুষ সে। এতদিন ধরে ওকে দেখছি, কোনো জটিলতা নেই ওর ভেতরে। আমাকে নিয়ে ওর টানের সুতো আমিই জটিল অংকে শিথিল করে রাখি। এক পুরনো হিসাবের কারণে আমি চাইলেও দাম্পত্য সম্পর্কের সুতো টানটান রাখতে পারি না। রাশেদ অবশ্য সচেতন অভিভাবকের মতো সর্বক্ষণ নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে, আমাকে ধরেবেঁধে রাখতে চায়। এই

যেমন আজ কিছুতেই ও আমাকে একা ছাড়তে চাইছিল না। যদিও বাসা থেকে খুব একটা বাইরে বের হই না আমি। তেমন কোনো প্রয়োজন হয় না। আমার সব প্রয়োজন রাশেদ দক্ষ হাতে মিটিয়ে দেয়।

আমি কোথাও যাচ্ছি শুনলে প্রথমে রাশেদ খুব অবাক হয়, অহেতুক বাদসাধে। তারপর আমি কথা শুনবো না নিশ্চিত হয়ে হাল ছেড়ে দেয়। আজও তাই করেছে। আমি পোশাক পাল্টে তৈরি হয়ে দেখেছি, ও নেটফ্লিক্সে মুভি দেখতে শুরু করেছে।

বাসা থেকে বের হয়ে দেখি রোদে পথঘাট সব চকচক করছে। অনেকদিন পর আলোর মুখোমুখি দাঁড়ালে যেমন দৃষ্টিবিভ্রম হয় তেমনি বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে আমি বাহন খুঁজতে থাকি। এই শহর এখন ব্যাটারিচালিত রিকশায় সয়লাব। আমি হাত উঁচু করতেই একজন বৃদ্ধ রিকশাওয়ালা তার প্যাডেলচালিত রিকশা নিয়ে এগিয়ে আসে। আমার তাড়া আছে। তবু বৃদ্ধের ঘামে ভেজা পরিশ্রান্ত মুখ দেখে আমি এই রিকশাতেই উঠে পড়ি।

রিকশাতে উঠতে আর নামতে গিয়ে মাথায় দুই দুইবার বাড়ি খাই। হুডে বাড়ি খেয়ে আমার রাশেদের কথাটা মনে পড়ে। নিজের অজান্তেই আমি শব্দ করে হেসে ফেলি। আমার মনের ভেতরের ঝড় সেই হাসিতে চাপা পড়ে যায়। বৃদ্ধ রিকশাওয়ালা খুচরো ফেরত দিতে দিতে আমার দিকে তাকিয়ে হাসে। তিনি কী বুঝেছেন তা 'আমি বুঝে পাই না।' আমার আবার হাসি পায়। আমার সঙ্গে রাশেদ যতোবার রিকশায় ওঠে ততোবারই হুডে মাথা ঠেকে হয় আমার চুল আটকে যায় নয়তো আমি মাথায় ভীষণ শব্দে বাড়ি খাই। রাশেদ হৈহৈ করে ওঠে, 'ঘাড় নিচু করে রাখতে পারো না? পোনে পাঁচফুটি একটা মানুষের মাথা কীভাবে হুড পর্যন্ত যায় আমি বুঝে পাই না।'

'আমি বুঝে পাই না' রাশেদের ঠোঁটে সবচেয়ে মানানসই আর দুবছরের বিবাহিত জীবনে আমার বহুলশ্রুত একটা বাক্য। আমি বের হবার সময় রাশেদ বলেছিল, 'এই ছুটির দিনে তুমি কোথাও না গিয়ে উনাকেই বাসায় নিয়ে আসতে পারতে, আমি বুঝে পাই না, বিদেশ থেকে আসা মানুষ, বাড়িতে কেউ নেই, সে তোমাকে কীদাওয়াত খাওয়াবে। তাও আবার রেস্টুরেন্টে হলেও হতো, বাড়িতে। ঠিকঠাক বাড়ি চিনে যেতে পারবে তো? আমি বুঝে পাই না।'

এই শহরের পথ আমি চিনবো না? এই শহর আমার পুরনো শহর। আমার ছেলেবেলার শহর। আমার চিরচেনা শহর। আর মোনালিসা আপাদের বাড়িটা আমার করতলের মতো চেনা। আপন। এই যে এই রাস্তার মাথাতে দাঁড়িয়েও আমি আপাদের নারিকেল গাছ ঘেরা বাড়িটা ঠিকঠাক চিনতে পারছি। এদিকটায় দীর্ঘবছর আমরা ভাড়া বাসায় ছিলাম। বাবার অফিস গণেশপাড়ার সামনের রাস্তা ধরে ঢাকা বাসস্ট্যান্ডের দিকে এগিয়ে পশ্চিমের বড় রাস্তার ধারে ছিল। অফিসের কাছাকাছি ছিল আমার স্কুল। স্কুল থেকে ফিরে রোজ বিকালে আমরা কজন আপাদের বাড়িতে যেতাম।

সেই সময়ে মোনালিসা আপাদের বাড়িটা ছিল গণেশপাড়ার সবচেয়ে আধুনিক বাড়ি। এখন আপাদের বাড়ির আশেপাশের ফাঁকা জায়গাগুলো আর ফাঁকা নেই। উঁচু উঁচু ইট-পাথরের দালান উঠে গেছে। আপাদের বাড়ির একটা বাড়ি পরেই আমরা ভাড়া থাকতাম। সেই পুরনো দোতলা বাড়িটা ভেঙে নতুন একটা পাঁচ তলা ভবন নির্মিত হয়েছে। ঐ বাড়িটা ভেঙে ফেলার তোড়জোড় শুরু হলে আমরা এই পাড়া ছেড়েছিলাম। মুলাটোলায় একটা বাড়িতে ভাড়া ছিলাম কিছুদিন। ঐ সময় বাবাও আমাদের বাড়ির কাজ ধরেছিল। পরে আমাদের বাড়ি এক তলা উঠে গেলে আমরা সাগরপাড়ায় চলে আসি।

মোনালিসা আপা আর নাহিদ ভাই ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ায় আবদুর রহমান চাচা বাড়ি ফেলে রেখে ঢাকায় চলে গিয়েছিল। আপাদের পরিবার ঢাকা যাবার আগ পর্যন্ত আমাদের দুজনের নিয়মিত দুই বাড়িতে যাওয়া-আসা ছিল। আপা রিতা বা কলিকে দিয়ে আমাকে খবর দিতো। আমি বুভুক্ষের মতো ছুটে যেতাম। মাঝেমাঝে পালিয়েও থাকতে চাইতাম। শুধু মোনা আপার কাছ থেকে না, নিজের কাছ থেকেও। সেই গল্প থাক। আজ আমি নিজেই তো ধরা দিতে উন্মুখ।

আমি গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেছি। এখানকার বাতাসে শৈশব-কৈশোরের আদি ঘ্রাণ। আকাশে স্মৃতির মাতম। আমার পা লেগে আসে। বুকের ভেতরের অভিমানের ঢেউ ভেঙে গুঁড়িয়ে যায়। কত কী জড়িয়ে আছে এই পাড়ার মানুষগুলোর সঙ্গে। পুরনো কেউ কি আছে? পুরনো স্মৃতির মতো পুরনো মাটি আঁকড়ে ধরে?

ঐ তো সেই বাড়ি। আমি স্কুলছাত্রীর ফিতে বাঁধা ঝুঁটির মতো নেচে উঠি। অবাক হয়ে দেখি, চারপাশে এতকিছু বদলে গেছে, বদলায়নি কেবল আবদুর রহমান চাচার আদি বাড়ির ঐ ঝুল বারান্দাটা। এই বাড়িটার দক্ষিণের ঝুল বারান্দায় একটা চেনা দৃশ্য আঁকা

থাকতো। আমি ওপরে তাকাই। বারান্দায় পাতা রট আয়রনের রংচটা চেয়ারে এক হাতে বই আর আরেক হাতে চায়ের কাপ নিয়ে মোনালিসা আপা ঝকঝকে রোদের ক্যানভাসে সেই চিরচেনা দৃশ্যটি এঁকে বসে আছে।

আকাশে মেঘ দুলছে। পুরো আকাশজুড়ে মনুষ্যাকৃতির অদ্ভুত বিষণ্ন সব মেঘ। গত বছর নভেম্বরে কালিম্পং, দার্জিলিংয়ে এমন মেঘ দেখেছিলাম। পরিবারের সদস্যের চাপে পড়ে প্রথম বিবাহবার্ষিকীতে আমাদের দুজনকে বেড়াতে যেতে হয়েছিল। ততোদিনে রাশেদ টের পেয়েছে, নিতান্ত অনিচ্ছাতে আমি বিয়েটা করেছি। যদিও ও এখন পর্যন্ত টের পায় না, আমি ঠিক কতোটা যন্ত্রণা নিয়ে গোপনে গুমরে গুমরে কেঁদে মরি। দাম্পত্যচর্চার দুঃসহ ভার নিতে না পেরে দিনরাত মরমে মরি।

রাশেদের স্বপ্নেরা প্রেতের মতো আমাকে ধাওয়া করে। ওকে আমি কিছুতেই বোঝাতে পারি না, আমার কাছে ওর জন্য কোনো প্রেম নেই। রাশেদ ভাবে, সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে, বিয়ের পর মানিয়ে নিতে সব মেয়েরই একটু সময় লাগে। অভিভাবকসুলভ হাসিতে ও আমার অস্থিরতাকে উপেক্ষা করে। যেন আমি অবোধ কিশোরী, আমাকে খুশি করতে এটা-সেটা উপহার দেয়, সপ্তাহে একদিন রেস্টুরেন্টে খেতে নিয়ে যায়। আমাকে ভালোবেসে প্রগাঢ়ভাবে জড়িয়ে ধরে, মায়ায়-আদরে ভরিয়ে দিতে ব্যাকুল হয়। রাত নামলে আমার শরীরে একতরফা বুঁদ হতে গিয়ে ব্যর্থ রাশেদ একসময় ঘুমিয়ে পড়ে। তবে এটা সত্যি আমাকে ও কখনো দোষারোপ করে না। শুধু কোনো কোনোদিন শিশুসারল্যে আমার প্রাক্তনের কথা জানতে চায়, জানতে চায় কেন এত বিষণ্ন আমি।

আমি ওর প্রশ্নের কোনো সদুত্তর দিতে পারি না। ওর কৌতূহলী চোখে বিদ্ধ হতে হতে আমার মরে যেতে ইচ্ছে করে। আমি ওকে বলতে পারি না, সেই কবে থেকে আমি বিষাদের ঘেরাটোপে আটকে আছি, এ থেকে আমার মুক্তি নেই।

মা যখন আমার বিয়ে ঠিক করে তখন নিজের ভেতরের দমবন্ধ করা কথাগুলো আমি কাউকে বলতে পারছিলাম না। কথা ভাগাভাগির মানুষ মোনালিসা আপা তখন মেঘের দেশ পাড়ি দিয়ে অনেক দূরে, মেধাবৃত্তি পেয়ে মেলবোর্নে পড়তে গেছে। স্কুলের বান্ধবীরা কে কোথায় হারিয়ে গেছে। পরে কলেজে পড়াকালীন কারো সঙ্গে সেভাবে ঘনিষ্ঠতাও হয়নি। নিজের মতো থাকতে থাকতে আমি পাথরের নিষ্প্রাণ মূর্তি হয়ে গিয়েছিলাম। এখনো হয়তো তাই-ই আছি। অদ্ভুত নিস্পৃহতায় জীবনকে টেনে চলছি শুধু।

রাশেদের সঙ্গে দার্জিলিংয়ে কাটানো সপ্তাহটিতে আমার জীবনের বেদনার সকল ঘড়া পূর্ণ হয়েছিল। ঐ কয়েকটা দিন রাশেদ আমার যতো ঘনিষ্ঠ হতে চাইতো, আমি ততো আড়ষ্ট হয়ে যেতাম। মেঘের ছায়ামাখা কাঞ্চনজঙ্ঘা আর সিকিমকে দূর থেকে দেখে আমার শরীর-মন জুড়ে থাকা বিষণ্নতা নীল মেঘের ডানা লাগিয়ে উড়তে চাইতো। একদিন আমি আনমনে পর্যটকদের ভিড়ে হারিয়ে যেতে যেতে ভাবছিলাম উড়ে যাবো, উড়ে উড়ে চলে যাবো অনেক দূরে। রাশেদ আত্মবিস্মৃত আমাকে টানতে টানতে হোটেলে ফিরিয়ে এনেছিল। সে রাতে মুখোমুখি বসে রাশেদ ছেলেমানুষের মতো আকূল হয়ে কেঁদেছিল। নিজে থেকেই প্রতিজ্ঞা করেছিল, আমি সহজ না হলে এসব বিষয়ে ও কখনো আমাকে জোর করবে না।

প্রথম প্রথম রাশেদকে আমি খুব সন্দেহের চোখে দেখতাম। মনে হতো সারাক্ষণ ও আমাকে উত্যক্ত করবে, অধিকারের মাত্রা দিয়ে চিহ্নিত করে দেবে আমার করণীয়, আমাকে নিজের মতো থাকতে দেবে না। আমাকে অবাক করে রাশেদ ওর কথা রেখেছে। সেই কারণেই হয়তো ওকে এখনো আমি ছাড়তে পারিনি।

রাশেদ একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ায়। সে নিজেও পড়ালেখায় ডুবে থাকতে ভালোবাসে। রাশেদ চায় আমিও আবার পড়ালেখা শুরু করি। কিন্তু আমার বাসার বাইরে যেতে ভালো লাগে না। অথচ একটা সময় আমি হৈ হৈ করে উড়তাম। আমার অবিরত উড়ানে বিরক্ত মা আমাকে শাসন-বারণে রাখতো। বি.এপাস করার পর বাবা মারা যাওয়ায় মা আমাকে চেপে ধরে বিয়ে দিয়েছিল। মোনালিসা আপার বাবাও তখন মারা গেছেন। আপা, চাচী, নাহিদ ভাই ঢাকাতেই থাকতো। মোনালিসা আপা ফোন করলেই বলতো, চাচী উনার বিয়েশাদি নিয়ে বাড়াবাড়ি শুরু করেছেন। বেশি বাড়াবাড়ি করলে কারো সঙ্গেই যোগাযোগ রাখবে না আপা। দেশ ছেড়ে পালাবেন।

আপা পালিয়েছিল। পালানোর পর আমাদের আর দেখা হয়নি। দেখা হয়েছিল অনেক আগে, সেই সেবার, যেবার আপার পরিবারের সবাই ঢাকায় চলে গেলো। সেদিন আপার বিষণ্ন চেহারা দেখে আমার খুব কান্না পাচ্ছিল। আমাকে বাচ্চামেয়ের মতো আলতো করে জড়িয়ে ধরে আপা বলেছিল, 'তোর সাথে সবসময় যোগাযোগ থাকবে রে।'

আপার সঙ্গে বরাবর আমার যোগাযোগ ছিল। ফেসবুকে, ভাইবারে। দুজনের রাশি রাশি মেসেজে মেসেজবক্স উপচে যেতো। সেই ছোটবেলার মতো শাসনে-প্রশ্রয়ে আপা আমাকে

আগলে রাখতো। কিন্তু এতে আমার বিষণ্নতা তিল পরিমাণও কমেনি। গোপন কষ্টের ভার দিনদিন বেড়েছে শুধু। এসব ফুলকো-ফুলকো কষ্টকে দুর ছাই বলে উড়িয়ে দেয়ার মতো আপন একটা মানুষও নেই না আমার। আমার আছে সুখ-অসুখে বোঝাই করা এক ওজনদার সিন্দুক। যার ভার বইতে গিয়ে আমি কখনোই জীবনের ক্লান্তিকে অতিক্রম করতে পারিনি।

মোবাইলের তীক্ষ্ণরিংটোনে আমি কেঁপে উঠি। মোনালিসা আপার কল। আরেকটু পরেই আপার মুখোমুখি হবো আমি। মোনালিসা আপা, আমাদের মোনা আপা, আমাদের জীবনে ছিল একটা স্ফুলিঙ্গের মতো। আমাদের বলতে আমাদের মহল্লার ছেলেমেয়েদের কাছে। আপার বুদ্ধিদীপ্ত চোখ-মুখ, সুডৌল শরীর, পিঠের ওপর ঢেউ খেলানো চুল, বয়সের তুলনায় ভারিক্কি চাল দেখলে যে কোনো যুবকেরই গলা শুকিয়ে আসতো। বুকের ভেতরে চেনা-অচেনা অনুভব পুষে রেখে কোনো কোনো যুবক আপাদের বাড়ির সামনের রাস্তার ধারের সেলুনে দিনভর বসে থাকতো। কেউ কেউ রাস্তার ধারের ল্যাম্পপোস্টে কায়দা করে এক পায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো, এক সিগারেটের পেছনে আরেক সিগারেট লাগিয়ে ধোঁয়াবাজি করতে করতে গোটা প্যাকেট ফুরিয়ে ফেলতো।

আমরা ভীষণ গর্ব করতাম আপাকে নিয়ে। ছুটে ছুটে আপাকে এসে খবর দিতাম, ‘হিরো ভাই এইবার শাহরুখ কাট দিছে। ফয়সাল ভাই আমির কাট। যা লাগতাছে না দুইজন রে! পুরা দা নিউ লায়ন সার্কাসের জোকার।’ স্কুল থেকে ফিরে নাকেমুখে দুটো খেয়ে নিয়ে আমি, রিতা, কলি মোনালিসা আপার কাছে তার প্রণয়প্রার্থীদের নানান বোকামানুষির গল্প নিয়ে হাজির হতাম। আপা সময়ে-অসময়ে বারান্দায় বসে চা খেতো। মাঝেমাঝে আমরা আপার হাতের বিখ্যাত লেবু চায়ের ভাগ পেতাম। নিতান্ত লোভীর মতো চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে জ্যাঠামো করতাম, ‘আজ ফয়সাল ভাইরে দেখছো আপা? এত ফাজিল না ছ্যামড়াটা! আসার সময়ও দেখলাম, দোকানে বইসা সিগারেট খায়। কলি রে ডাক দিয়া কয়, তোর মোনালিসা আপা রে বলিস, আমি রক্ত দিয়া তার নাম লিখ্যা যামু।’ মোনালিসা আপা নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে আমাদের কথা শুনতে শুনতে চায়ের কাপে ঠোঁট ছোঁয়াতো। তারপর আমাদের চকচকে উৎসাহে পানি ঢেলে দিয়ে হাতে থাকা তারাপদ রায়ের বই থেকে আবৃত্তি করতো,

‘সব কথা তোমাকে জানাবো ভেবেছিলাম

কিনে এনেছিলাম আকাশী রঙের বিলিতি হাওয়াই চিঠি'

এভাবে কবিতা পড়তে পড়তে হুট করে একদিন মোনালিসা আপা কবিতার মতো রহস্যময় হয়ে গেলো। আপার গোছা গোছা চুল বিনা নোটিশে কেটে ফেলল। আমরা অবাক হয়ে দেখলাম, আপার ভারি ভারি চোখের পাপড়ি কেমন ঘন হয়ে উঠছে। হুট করে কেমন যেন বড় হয়ে গিয়েছিল আপা, বদলে গিয়েছিল।

আপার হাসি, চাহনি, কণ্ঠস্বর সবকিছুই তখন আমাদের সবাইকে ধোঁয়াশার মধ্যে ফেলে দিতো। তখন আমি কলেজে ভর্তির অপেক্ষায় আছি। কলি একদিন আমার হাতে চিমটি কেটে বললো, 'মানুষ প্রেমে পড়লে এমন হয় রে...আপা লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেম করছে দ্যাখ গিয়া। পটকা খাস্তগীরকে দেখলাম আপাদের বাড়ির উল্টোদিকের ঐ বাড়ির ছাদে পাহারা দেয়। ছি, ছি, আপার রুচি এতো খারাপ। ফয়সাল ভাই রে একেবারে আমির খানের মতোন লাগে। কত ঘুরলো আপার পিছে, পাত্তা দিলো না।' আমি কলির কথা পাত্তা দিতাম না। আমিও ততোদিনে বড় হয়ে গেছি।

পুরো বাড়িতে ভেজা ভেজা গন্ধ। সিঁড়িঘরের নিচে রাখা ফুলের টবগুলোতে শুষ্ক মাটি, গাছের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। বোঝা যায়, বাড়ির মানুষজনের আসা-যাওয়া নেই তেমন একটা। সিঁড়ির ধাপ ভেঙে উঠতে উঠতে দেখি মোনালিসা আপা একটা গাঙশালিকের মতো উড়ে উড়ে আসছে। আমাকে দেখেই আপা চিৎকার করে ওঠে, রিক্তা...তুই কত বড় হয়ে গেছিস রে!

আমি হাসি, 'এ কী কথা আপা! আমি তো বড়ই ছিলাম!' মোনা আপা আমার হাত ধরে সিঁড়ির ধাপ পার করায়, যেন আমি ছোট্ট রিক্তা।

—তা তো ছিলিই। এখন পুরো অন্যরকম হয়ে গেছিস।

—ফেসবুকে তুমি আমার ছবি দ্যাখোনি?

—ইস! তা তো দেখিই। কিন্তু সামনাসামনি দেখার মধ্যে পার্থক্য কত বল তো! আর আমাদের কত বছর পর দেখা!

আমি নিচু স্বরে বলি, 'তিন বছর আট মাস ছয় দিন পর।'

মোনা আপা বিস্ফোরিত চোখে তাকায়। বলে, 'তুই দেখি দিন তারিখ একেবারে গুণে রেখেছিস!'

আমি সুযোগ পেয়ে ছোট্ট রিক্তার মতো গাল ফুলাই, ‘তা তো রেখেছিই। আমি কি আর তোমার মতো?’

—আমি কী রে! পড়ার জন্যই তো গেলাম।

—পড়ার জন্য না ছাই। আমাদের ছেড়ে, সবাইকে ছেড়ে...।

—আমারও খুব খারাপ লেগেছে রে রিক্তা।

—ছাই খারাপ লেগেছে। ওখানে তো নতুন বন্ধু পাতিয়েছো তুমি, সমস্যা কী?

মোনা আপা শব্দ করে হাসে, আমি চমকে যাই। কী সুন্দর হয়েছে আপা! মসৃণ চুল, দীপ্তিময় মুখশ্রী। উজ্জ্বল চোখে গাঢ় কাজলরেখা। শরীরের কমলা রং ফেটে পড়ছে। লং স্কার্ট আর হাইনেক গেঞ্জিতে আপাকে বিদেশি কোনো মডেলের মতো লাগছে। আপা আমার হাত টানে, ‘আয় তো, কত কথা যে আছে তোর সঙ্গে।’

রাশেদ ফোন করেছে, পৌঁছেছি কিনা জানতে চেয়ে। আমার কথা শেষ হতেই মোনা আপা হাত থেকে মোবাইল কেড়ে নেয়, ‘এক্কেবারে সুইচড অফ করে রাখ। কারো সঙ্গে আজ কোনো কথা নেই। আগে বল কী খাবি?’

মোনা আপার কথা না ফুরাতেই একজন মাঝবয়সী মহিলা ট্রেতে করে দুই গ্লাস শরবত নিয়ে আসে।

—ভাল হয়েছে মানুষ পেয়েছো, এত দিনের পড়ে থাকা বাড়ি, কারো হাত পড়েনি কতদিন। কে করতো এত কাজ।

—এসব সাংসারিক কথা বাদ দে, কী খাবি দুপুরে বল?

—সবকিছুর আগে তোমার হাতের চা চাই।

ঠিক এই মুহূর্তে আমি আর মোনা আপা ঝুল বারান্দায় বসে ‘মোনালিসা আপার বিখ্যাত লেবু চা’ খাচ্ছি। উষ্ণ চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে আমরা মুগ্ধচোখে দেখছি, আকাশের বুকে মেঘের আশ্চর্য নিমগ্নতা। কোথাও কোনো শোরগোল নেই। আমাদের দুজনের মুখে কোনো শব্দ নেই। মনের ভেতরে না বলা কথার বুদবুদ। সুখ-দুঃখের ফিসফিসানি। বাতাসও ফিসফিস করে ওঠে, ‘এসো, শরীরে জড়িয়ে নাও মেঘের পালক।’

হাওয়ার খেলায় দুলতে দুলতে মেঘেরা রেখার আদলে বদলে যেতে থাকে। মেঘের সাদা, নীল, ধূসর পালকগুলো কোনাকুনি জুড়ে গিয়ে আকাশে অদ্ভুত এক অবয়ব তৈরি

হয়। শব্দহীন মোনা আপা আর আমি, দুজনে চুপচাপ বসে সমকোণে নিমগ্ন মেঘ দেখতে থাকি।

সুন্দরের নিবিড় নিমগ্নতা ভেদ করে বহু দূর থেকে মোনা আপার কণ্ঠ শোনা যায়, 'কেমন আছিস তুই?'

বুকজুড়ে থাকা অভিমান আমার কণ্ঠনালীতে আছড়ে পড়ে, 'কেমন থাকবো আবার?' এতক্ষণ নিজেকে ধরে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা ব্যর্থ করে আমি ভেঙে পড়ি। দার্জিলিংয়ে কাটানো রাতগুলোতে রাশেদের অনাকাঙ্ক্ষিত স্পর্শের কথা মনে পড়ে। আমার সমস্ত শরীর পুড়তে থাকে, জ্বলতে থাকে তুমুল ক্ষোভে। যেন শত শত মৌমাছি হুল ফোটায় আমার নিরাভরণ শরীরে। সেই বিষ আমি উগড়ে দিই বাতাসের স্রোতে, 'তুমি তো ভালোই ছিলে। রায়নাকে নিয়ে। আমার কথা ভেবেছ একবারও?'

—রায়না আর তুই এক হলি?

—হুম, আমি তোমার কে?

'তুই? তুই আমার প্রিয়তম পাপ। হাহাহা।' মোনা আপার হাসিতে আপার সৌন্দর্যের ছটা। দেখে আমার ভীষণ রাগ হয়।

'এত কঠিন কথা বুঝি না মোনা আপা।' বলতে বলতে আমার বুক ফেটে কান্না আসে। আমি ভেজা চোখে সামনে তাকাই। মোনালিসা আপার ঠোঁটের কোণে ভিঞ্চির মোনালিসার হাসি। আমি মুগ্ধচোখে আপাকে দেখি, এত সুন্দর মানুষ হয়! এই সুন্দরের পাশে সাদামাটা সালোয়ার কামিজ পরনে বিষণ্ন রিক্তা একেবারে দীনহীন ভিখারির মতো দাঁড়িয়ে আছে।

মোনালিসা আপা আমার পুরনো প্রেমিকের মতো আমার দিকে হাত বাড়ায়। আমার সেই প্রেমিক আমাকে বলেছিল, ভালোবাসি কথাটা জীবনে একবারও না বলে সহস্রবার সহস্রভাবে অনুভব করা যায়। সেই বিচিত্র অনুভবে বহুদিন পর আমার শুষ্ক শরীর প্লাবিত হয়। আমি সম্মোহিতের মতো মোনার হাত ছুঁই। নিমীলিত চোখে অপেক্ষা করতে করতে তলিয়ে যাই গভীর খাদে।

মোনা আমাকে গভীর প্রশ্রয়ে টেনে তোলে। আমি মোনার হাত ছুঁয়ে কবুতরের ডানা পেয়ে যাই, ঘাড়-গলার পালক ফুলিয়ে মোনার কানের কাছে বাকবাকুম করি, 'এতোদিন কোথায় ছিলে!' মোনা কথা না বলে নরম রোদের উত্তাপ ছড়ায়।

আমি জানি মোনা কোথায় ছিল। আমার ঠোঁটে-গালে-নাকে মোনার ঠোঁটের অবিনাশী উত্তাপ লেগে আছে। মোমের মতো গলে গলে আমি টের পাই মোনার স্পর্শের উষ্ণতা আজও সেই পাপের মতো নিবিড়, যার রং ছিল বেগুনি, নীল, আসমানি, সবুজ, হলুদ, কমলা আর লাল। মোনা কাঁদে, আমি কাঁদি, প্রবল সুখের অনুভবে। ঠিক তখনই বিজলির আখ্যান ভেঙে বৃষ্টিবিরতির রংধনু আকাশের বহুতল মেঘের পরে শরীর এলিয়ে দেয়। মনভুলানো বাহারের এ রংধনু রহস্যময় সুন্দর। বিমূঢ় আমরা এর রহস্য বুঝি না। কেবল বুঝি, এই রংধনুই জানে, একজন মানুষের সঙ্গে আরেকজন মানুষের গড়ে ওঠা সম্পর্কে কতো গোপন পরত থাকে, প্রতি পরতের থাকে আলাদা আলাদা গোপন ঘ্রাণ।

আমি আর মোনা শরীরে মেঘের পালক লাগিয়ে সেই ঘ্রাণের সরোবরে ডুবসাঁতার কাটতে থাকি।

(রচনাকাল: ২০১৯, গল্প সংকলন: মেনকি ফান্দার অপরাধ কিংবা পাপ)

আগন্তুক

শহরে এক আগন্তুক এসেছে। এত শত মানুষের ভিড়েও সবার নজরে পড়ার মতো বেশভূষা আর চলাফেরা তার। মুখে ফুরফুরে দাঁড়ি, মাথার চুলে আঁটসাঁট ঝুঁটি, রোদে ঝলসানো তামাটে গায়ের রঙ। পরনে হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালার আলখেল্লা, বাম কাঁধে একটা পেটমোটা ঝোলা নিয়ে শশব্যস্ত লোকটি হেঁটে চলছে মাইলের পর মাইল।

অনেকদিন হলো এই শহরে কোনো ইস্যু নেই। আবর্জনার ভাগাড় হতে হতে শেষ পর্যন্ত তিনশ ফুটের ইছামতী ত্রিশ ফুটের নর্দমায় পরিণত হওয়ায় 'ইছামতী নদী বাঁচাও' ইস্যুও মুখ থুবড়ে পড়েছে। জাল দলিল, আমলনামা আর ওয়ারিশনামার বদৌলতে ডজনের ওপরে সরকারি, অনিবাসী ও পরিত্যক্ত বাড়িঘর বেদখল হবার ইস্যু নিয়ে কিছুকাল জাতীয় ও স্থানীয় পত্রিকাগুলো সরগরম থাকলেও কার ইশারায় যেন তা ঘুমিয়ে গেছে। সর্বশেষ সংবাদ পাওয়া পর্যন্ত 'নিরাপদ সড়ক চাই' দাবিতে আন্দোলনরত উচ্চকিত শিশুকণ্ঠীরাও তাদের মায়েদের বুকে ফিরে গেছে।

শহরের এখানে-সেখানে উপচে পড়া ডাস্টবিন, রাস্তার খানাখন্দ, প্রশ্নপত্র ফাঁস, অলিগলির অপরিসর বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থা, দিন না ফুরোতেই এডিস-এনোফিলিসের কলতান, নিজের বাসায় দুর্বৃত্তদের চাপাতির কোপে নিহত সাংবাদিকের নিরাপত্তাহীন পরিবারের উৎকণ্ঠা ইত্যাদি সব ইস্যুই এখন দেশের বাদবাকি জেলা শহরের মতো শহরবাসীর অভ্যাসের অংশ হয়ে গেছে। বরং এসবের কোনো একটির কমতি দেখলেই এখন তারা সন্দেহের চোখে তাকায়, মনে মনে খোঁজে—কী যেন নেই, কী যেন নেই। আর কিছু ইস্যু গুজব হিসেবে চিহ্নিত হয়ে এই মাঘ মাসেও হিমাগারে গেছে। তাই একান্ত বাধ্য হয়ে নিরামিষভোজী হওয়া শহরবাসীরা বহুদিন বাদে আমিষের দেখা পেয়ে আগন্তুককে

নিয়ে আলোচনায় মেতেছে। অনেকেই যারপরনাই উৎসুক হয়ে আগন্তুকের গতিবিধির দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখছে। আপাতত এই আগন্তুকই শহরের নতুন ইস্যু।

আগন্তুক ছুটছে। শহরের এ মাথা থেকে ও মাথা। খবর রটেছে সে এখনো কিছু খায়নি। এই সাতদিন কেউ তাকে এক ঢোক পানিও খেতে দেখেনি। এই কনকনে ঠান্ডার দিনে কেউ তাকে বাড়তি একটা চাদরও গায়ে জড়াতে দেখেনি। তবে গতকাল একটা নতুন বিষয় ঘটেছে। হিরুর চা দোকানের সামনে। এই দোকানটি ডিগ্রি কলেজের মোড়ে যার অদূরে মৃত ইছামতী। গতকাল সকালের সবচেয়ে ব্যস্ততম সময়ের ঘটনা এটা। নয়টার দিকে, শীতের সকালে চায়ের দোকানের ব্যস্ত সময়। ঠিক তখনই বিস্ময়াপন্ন চোখে হিরু চোখের সামনে ঘটনাটি ঘটতে দেখেছে। হিরু গতকাল থেকে আজ অবধি যতোজনের সাথে দেখা হয়েছে ততোজনকেই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দিয়েছে। প্রতিবার অবশ্য বর্ণনার মুকুটে একটা দুটো নতুন পালক যুক্ত হয়েছে।

—বুইঝলে কাশেম ভাই, আমি ট্যারে ট্যারে দেখতিছি, ব্যাটা কী করে। হঠাৎ দেখি সে ব্রিজের পাশ দিয়্যা লুক কইরে নামতিছে, কান্ধে হাইত্যের সাইজের এক ঝোলা। তারপর ব্যাটা হটাস কইরে ইছামতীর পানিত নাইবে গেল। তহনই পানি হয়্যা গেল দুধের মতোন ফকফকা, পুরা ইছামতীর বুকে ফট কইরে হাজার পদ্ম ফুইটে উঠল! আমার চোহে তো ধান্দা লাইগে গেল।

সকালে রাধানগরের তাইফুরের কাছে ঘটনার বর্ণনা করার সময় পদ্ম ফুলের অংশটুকু ছিল না। দুপুরে জোলা কাশেমের কাছে ঘটনার বয়ানের সময় তা নতুন করে যুক্ত হয়েছে। যদিও এটা সত্যি যে গতকাল অদ্ভুত এক ঘটনার সাক্ষী হয়েছে হিরু। সে সত্যি সত্যি আগন্তুককে এই শীতের মধ্যে ইছামতীর নোংরা কালো কুটকুটে পানিতে নামতে দেখেছে। কিন্তু তাকিয়ে তাকিয়ে চোখ ক্ষয়ে গেলেও হিরু তাকে পানি থেকে উঠতে দেখেনি। এই এক হাঁটু নোংরা পাঁকের মধ্যে মানুষটা কীভাবে ভোজবাজির মতো উধাও হলো! এ নির্ঘাৎ জাদুকর! ভাবতে ভাবতে হিরু চা বানাতে দেরি করে ফেলে। কাস্টমারের গালাগাল এড়াবার জন্য প্রতি কাপে বাড়তি আধচামচ কনডেন্সডমিল্ক মেশাতে মেশাতে হিরু আবার ভাবনায় পড়ে যায়।

আগন্তুককে কাছ থেকে দেখলে মনে হয় সে নিজেও খুব ভাবনায় আছে। দুএকজন সাহসী লোক তাকে থামিয়ে কথা বলার চেষ্টা করেছে, কী বিষয়-আশয় জানতে চেয়ে প্রশ্ন

করেছে কিন্তু সে তাদের সাথে কোনো কথা বলেনি। অনুভূতিহীন চোখে-মুখে প্রশ্নকর্তার দিকে তাকিয়ে আবার নিজের রাস্তা মেপেছে। এডওয়ার্ড কলেজ, পলিটেকনিকের রাস্তা ধরে হেঁটে সে এখন শহরের দক্ষিণ রাঘবপুরে জোড়বাংলা মন্দিরের শান বাঁধানো পুকুরের কাছে দাঁড়িয়েছে। মন্দিরের চারদিকে নির্মিত অসংখ্য বাড়িঘরের আড়ালে থাকা এই মন্দির বাইরের রাস্তা থেকে দেখা না গেলেও ছেলে-ছোকরার দল আগন্তুকের অবস্থান ঠিকই নজরে রেখেছে। মন্দিরের সামনে আগন্তুককে দাঁড়াতে দেখে পাবনা জিলা স্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র শাফায়েত পাশে দাঁড়ানো বন্ধু জাফরের হাতে চিমটি কাটে,

—ব্যাটা হিন্দু, বুঝলি।

জাফর ফিসফিস করে বন্ধুর কথায় সম্মতি জানায়,

—এখন মনে হয় পূজা করবে। হুম, বলিও দিতে পারে। সাবধান, পিছনে যা, পিছনে যা...

এভাবে মন্দির-মসজিদ, রাস্তাঘাট যেখানেই আগন্তুক যাচ্ছে কৌতূহলী কেউ না কেউ তার পিছু নিচ্ছে। দশ-এগারো বছরের ছেলেরা নিরাপদ দূরত্ব রেখে তার পিছু হাঁটে। ওরা ভয় পায়। মায়ের কথামতো ওদেরও যদি জাদুকর ওই ঝোলায় ভরে নতুবা বাঁশির সুরে ভুলিয়ে ভাগিয়ে নিয়ে যায় কোনো দ্বিখণ্ডিত পাহাড়ের ভেতরে।

মুরুব্বীরা দোকানের চায়ের কাপ-পিরিচে ঝড় তোলে। ইছামতীর ওপরে বড় ব্রিজের ধারে আড্ডারত যুবাদের মনে হাজার সন্দেহ জেগে ওঠে। কে এই আগন্তুক, কী চায় সে? কোনো মতলব নিয়ে সে ঘুরছে না তো? স্থানীয় থানায় গিয়ে দারোগা সাহেবকে সংবাদ দেয়ার ব্যাপারেও কেউ কেউ একমত হয়। কেউ আবার ফিকফিকিয়ে হাসে, 'আরে ব্যাটা পুরাই পাগল, লিচ্চিত মেন্টাল থেনে ভাগিছে।' বিচক্ষণ কেউ কেউ আন্দাজ করে, এই আগন্তুক আর কেউ না, কোনো ভ- সাধু। জ্যোতির্ময় পুরুষের ভেক ধরে কদিন শহরের এদিক সেদিক ঘুরবে তারপর কোনো বুড়ো অশ্বত্থের নিচে গাঁট হয়ে বসে মানুষ ঠকানোর ব্যবসা শুরু করবে। এমনও হতে পারে লালসালুর সীমানা গেড়ে সে নিজেকে পীর বলে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করবে। তবে কেউ কেউ আগন্তুকের অপার্থিব ক্ষমতার অলীক গল্প ফেঁদে তার ওপর অগাধ বিশ্বাস রাখতেও উন্মুখ হয়ে আছে।

এভাবে শহরবাসীরা আগন্তুককে ঘিরে অনেক ধরনের জল্পনাকল্পনা করে। মানুষ স্বভাবতই এমন। পৃথক বৈশিষ্ট্যধারী কোনো মানুষ বা বস্তুকে দূর থেকে দেখে মানুষ

সম্ভাবনার মোড়কে নানান গল্প রচনা করে। হোক সেই বৈশিষ্ট্য ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অথবা বিশাল। সেই মানুষ বা বস্তুকে নিয়ে অলীক আর অসম্ভব ভাবনার বুদবুদ তার রুদ্ধ করোটিতে ঘুরপাক খায়। সেই ঘূর্ণিতে পাক খেতে খেতে কোনো কোনো মানুষ যেমন নিজেকে খুব বিচক্ষণ ভাবে তেমনি অন্যের অস্তিত্ব নিয়ে সন্দিহান হয়, তাকে কটাক্ষ করে। এর উল্টোও ঘটে। কোনো কোনো দুর্বলচিত্তের মানুষ পূজারী হয়ে মানুষটিকে দেবতার আসনে বসায়; ভাবে, একদিন এই দেবতার উছিলাতেই তার শাপমোচন হবে। সকল মুশকিল আশানও হবে।

মানুষই সেই আজব প্রাণী, যে নিজেকে সৃষ্টির সেরা জীব দাবিকরেও নিজেই নিজের শ্রেণি পুনঃনির্ধারণ করে। নিজেই নিজেকে ভিখারী বানায়, অন্যকে দেবতা বা মহাপুরুষের আসনে বসায়। বঞ্চনা আর অতৃপ্তির ঘেরাটোপে বন্দি থেকে কোনো মহাপুরুষের আগমনের আশায় দিন গোনে। যা কিছু তার নিজের করার সাহস বা শক্তি নেই তা যেন কোনো অলৌকিক লৌকিকতায় পূরণ হয় সেই বাসনা মনের নিভৃতে জিইয়ে রাখে।

কাশেম তেমনই একজন মানুষ, যে জন্মের পর থেকে পঞ্চাশ বছর ধরে এমনই একজন মহাপুরুষের অপেক্ষায় আছে। সে বিশ্বাস করে তার জন্য সৃষ্টিকর্তা জীবনের প্রতি পদে পদে ফাঁদ তৈরি করে রেখেছে। সেই ফাঁদ থেকে নিষ্কৃতির পথ খুঁজতে খুঁজতে তার চুলে পাক ধরেছে। তাঁতের হারিয়ে যাওয়া খটখট শব্দের সাথে কালে কালে সে স্বপ্নপূরণের সকল বাসনা খুইয়ে বসে আছে। গত শুক্রবার ঐতিহাসিক মাসুদ খাঁ কাবলির মসজিদে জুম্মার নামাজ আদায় করে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ জানিয়ে এসেছে কাশেম। সে খুব ধর্মনিষ্ঠ। ভক্তিমান কাশেম বিশ্বাস করে সৃষ্টিকর্তা যে কোনো মহাপুরুষের উছিলায় ময়নাকে সুস্থ করে দিতে পারেন, তাঁতের খটখটানি ফিরিয়ে দিতে পারেন। কে জানে হয়তো এই আগন্তুকই সেই মহাপুরুষ। নিভু নিভু প্রদীপের শিখার মতো আশার আলোটুকু ম্রিয়মাণ হলেও এখনো তা নিভে যায়নি। তাই কাশেম দোগাছি থেকে আজ জামাইপাড়া অবধি এসেছে।

শোনা গেছে, দিনশেষে আগন্তুক জামাইপাড়ার শেষমাথার ধানী জমির সীমানায় বাবলা গাছের নিচে এসে বিশ্রাম নেয়। এই জমিতে এখন চাষবাস হয় না। শেষবার আমন কাটা হলে আর ধান রোপা হয়নি। শুকনো খরখরা মাটিতে ঝোপঝাড়, নলখাগড়া, বনখেজুর গাছ বেড়ে উঠেছে। প্রতি সপ্তাহে একবার লোকজন এসে মালিকের সাথে দরদাম করে

যায়। অচিরেই কেউ বসতি গড়বে। নারায়ণপুরের জামাইপাড়ায় জামাইদেরই বসবাস। শ্বশুরবাড়ির এলাকায় এসে ধানী জমি কিনে নিয়ে বাড়িঘর তৈরি করে জামাইবাবাজিরা বসতি গড়ায় এই এলাকার নাম জামাইপাড়া। দশ বছর আগেও কিছু জমি ফাঁকা পাওয়া যেতো। এখন যেদিকেই তাকানো হোক না কেন কংক্রিটের দেয়ালে চোখ আটকে যায়।

কাশেম মাথা থেকে বোঁচকা নামায়, এই শীতেও তার কপালে ঘাম দেখা যায়। বোঝা মাথায় পথে পথে হাঁটার পরিশ্রম আর মনের অবসাদ সব মিলিয়ে ক্লান্তিতে ওর নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। মাগরিবের নামাজের ওয়াক্ত শেষ হতে অল্প সময় বাকি। কাশেম নতুন একটা গামছার ভাঁজ ভেঙে জমিনে বিছিয়ে নামাজে দাঁড়ায়। ব্যবসার মাল থেকে নিজের জন্য সাধারণত কোনো মাল নেয় না সে, এই গামছাটা গেল সপ্তাহে পাইকারই ওকে দিয়েছে। ফেরি করে বেড়ানোর সময় নামাজের ওয়াক্ত হলে এখন গামছাটা বেশ কাজে দিচ্ছে। কিয়াম বাঁধতে বাঁধতে কাশেমের মন শান্ত হয়ে আসে।

কাশেম তাঁতী। এই শহরের লোকজন বলে, ও জাতে জোলা। ওর স্ত্রী শেফু বলে,

—আমাগের ধম্মে কিআর হিন্দুদের মতোন জাত-পাত আছে? তবে ক্যান পাড়ার লোকজন এখনও তোমাক জোলা কয়ে ডাকে?

কাশেম হাসে।

—কী কও বউ? লোকে যে তোমাক জোলার বউ কয়, তোমার খারাপ লাগে? আমার তো গইরবে বুকের ছাতি ফুলি যায়।

—উহ, তাঁত, মাকু, দক্তি কিছুই নাই? সে কিনা জোলা? হইছ তো ফেরিওয়ালা। বাড়ি বাড়ি লুঙ্গি-গামছা ফেরি কইরে বেড়াও।

মা বাবাকে জব্দ করছে দেখে ময়না ওর অনড় শরীরে ঝাঁকি দেয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করে মাথা দুপাশে ঘুরাতে থাকে। তারপর মুখ বাঁকিয়ে ওর একমাত্র শব্দাস্ত্র ‘এ্যা…এ্যা’র পুনরাবৃত্তি করতে করতে মাকে পাল্টা শাসায়। মেয়ের ঠোঁটের পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়া লালা মুছতে মুছতে কাশেম স্ত্রীর অসহিষ্ণু চেহারা দেখে মিটমিট করে হাসে। সেই হাসি নিভে যাওয়া তারার অবলম্বন হয়ে ওদের সংসারে আলো দেয়। কিন্তু ওপরে ওপরে যতোই হাসুক সে, স্ত্রীর কথা শুনে বুকে তার শোঁ শোঁ শব্দে তীব্র ঝড় বয়। সেই ঝড়ে দিশেহারা নাবিকের মতো কাঁপা কাঁপা হাতে সে ছিন্ন পাল তোলার চেষ্টা করে চলে, কোনো লাভ হয় না।

কাশেমের বাপ-দাদা ছিল তাঁতী। বংশানুক্রমিক ব্যবসা ধরে রাখতে ব্যর্থ হওয়া কাশেম এখন কাপড় ফেরি করে বেড়ায়। বংশের মান রাখতে না পারার লজ্জা ওকে যতো না কাবু করে তার চেয়ে বেশি কাবু করে প্রতিবন্ধী মেয়ে ময়নার উদভ্রান্ত মুখ, দিকভ্রান্ত দৃষ্টি। আল্লাহতায়ালা কাশেমকে একটাই সন্তান দিয়েছেন যাকে বুকে করে সে সংসারের অভাব-অভিযোগ ভুলে থাকতে পারতো। কিন্তু উল্টো এই সন্তানই ওকে ভাগ্যবিমুখ আর অভিশপ্ত করে রেখেছে।

সালাম ফিরাতে গিয়ে কাশেম টের পায় আকাশের আগুনরাঙা চোখ নিভে গেছে। সন্ধ্যার রংও পাল্টে যাচ্ছে দ্রুত। মোনাজাত ধরতেই ওর একমাত্র চোখ ভিজে উঠে মুক্তো ঝরে। পুরনো সব ফরিয়াদ ওপরে নতুন করে জানিয়ে কাশেম চোখ মুছতে মুছতে কাপড়ের বোচকাটা নিজের দিকে টেনে গামছার ওপরে বসে। কারো ইশারায় সব শব্দ থেমে গেছে। তবু নির্জনতার শব্দকুহক কাশেমকে কাবু করে ফেলে। হৃদয়ভারে তিষ্ঠাতে না পেরে ও বোচকায় পিঠ হেলান দেয়। অতীত ওকে খোঁজে। কাশেম চোখ বন্ধ করে পালাতে চায়। বর্তমানের চেয়েও স্বচ্ছ সব অতীতস্মৃতি ওকে নিয়ে চক্কর কাটে মাঠের পর মাঠ।

বাল্যবন্ধু ছায়েদুলের গুলতির গুলিতে শৈশবে কাশেমের একটা চোখ গলে গিয়েছিল। বন্ধুর অঙ্গ হারানোর অনুতাপে ছায়েদুল নিজেকে ক্ষমা করেনি, সবসময় বন্ধুর চোখ হয়ে থেকেছে। ময়নার জন্মের পর দুবন্ধু ঠিক করেছিল দুজন দুজনের কুটুম হবে। তখন এইটুকুন ময়নার রাজকন্যার মতো চেহারা ছিল। ছায়েদুল বউ নিয়ে ওর বাড়ি এলে ময়নাকে কোলে নিয়ে খুব সোহাগ করতো। সেই মুক্তোফোটা দিনগুলির শোকে কাশেমের বুকে হুহুপাখি মাতম জুড়ে দেয়। ছায়েদুল নেই। বিয়ের বছরখানেকের মাথায় তাগড়া যুবক ছায়েদুল পেটের ব্যথায় তড়পাতে তড়পাতে মারা গিয়েছিল।

তাঁতীরা নানান পেশায় জড়িয়ে গেলেও মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ছায়েদুল বাপ-দাদার ব্যবসা ছাড়েনি। নিজের পুঁজি শেষ করে মহাজনের কাছ থেকে পুঁজি এনে শুধু মজুরির বিনিময়েও তাঁত চালু রেখেছিল ছায়েদুল। বলতো, ‘জান গেলিও তাঁত ছাড়বো না নে।’ ছায়েদুলের জান নেই, ওর বিরান ভিটায় তাঁতের খটখটানিও নেই। কাশেমের বাড়ির আশেপাশের দশ-বারো ঘরে তাঁতের খটখটানি আছে। গত কয়েক বছরে দিনও ফিরেছে অনেকের। কাশেমের দিন ফেরেনি। ও তবু আশায় দিন গোনে। ওর নষ্ট চোখ ঠিকরে

আলো বের হয়। সেই আলোতে আশাফুল লক্ষ তারা হয়ে জ্বলে। গণনাকাল অচিরেই শেষ হবে ভেবে ওর বুকে আরাম লাগে।

নির্জনতাকে খানখান করে ভেঙে কিছু উদ্বাস্তু পাখি কাছেপিঠে অচিন সুরে ডেকে ওঠে। একসময় ওরা উড়তে উড়তে স্মৃতির মতো অন্ধকারে হারিয়ে যায়। ঘনান্ধকার প্রান্তর পেরিয়ে দূরে কিছু শহুরে বাতি জ্বলছে। কাশেমের বাড়ি ফিরতে দেরি হলে মা-মেয়ে দুজনেই অস্থির হয়ে উঠবে। বাবাকে দেখলে ময়নার অস্থিরতা থিতিয়ে এলেও শেফুর অস্থিরতা বেড়ে যায়। নিজের গর্ভকে দোষ দিতে দিতে সে মেয়ের মলমূত্রের গন্ধমাখা জামাকাপড় পাল্টায় আর খুনখুন করে কাঁদে। স্ত্রীকে সান্ত¡না দেবার কোনো স্বস্তিকর পথ খুঁজে না পেয়ে ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে কাশেম তখন ঘরের দোর দিয়ে শুয়ে পড়ে। এখন বয়স হয়েছে তার, বেশি মানসিক চাপ নিলে বৃদ্ধ চোখে ঘুম নেমে আসে। কাশেম হাই তোলে।

হিম হিম ভেজা বাতাস বইছে। শীতের রাতে অন্ধকার দ্রুত জমাট বাঁধে। গায়ের চাদর ভালো করে পেঁচিয়ে নিয়ে তৃষ্ণাতুর কাশেম সামনের দিকে তাকিয়ে থাকে। মশার ঝাঁক উড়ে এসে ওর নিরবচ্ছিন্ন বসে থাকায় ব্যাঘাত ঘটায়। রক্তচোষা ডুমো ডুমো মশাদের অত্যাচারে উঠে দাঁড়াতেই কাশেম চমকে যায়। আঁধারের পর্দা ভেদ করে একটা আলোর বিন্দু ফুটে উঠেছে।

ঐ তো আগন্তুক এসেছে!

পাতাহীন বাবলা গাছের গোড়ালিতে কায়দা করে শরীর ঠেস দিয়ে বসেছে মানুষটা। কাশেমের চোখের পলক পড়ে না, যেন কোনো স্বর্গীয় ছবি দেখছে ও। ওর শরীরের পেশী শিথিল হয়ে আসে। মাঘের কুয়াশা জাল বিস্তার করতে শুরু করেছে। চতুর্দিকে অখণ্ড নীরবতা ঘিরে আছে। আচমকা আগন্তুকের মাথার ওপর এক রাশ আলো নেমে আসে। দেখে কাশেমের চোখ ভিজে যায়; ভক্তিতে মাথা অবনত হয়, হ্যাঁ ঐ তো সেই মহাপুরুষ, সে আর কেউ নয়। কাশেম এক ছুটে আগন্তুকের কাছে যায়। নিজের বুক তোলপাড় করা শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রবল শব্দে ও কেঁপে ওঠে। কাছেপিঠে কেউ নেই। ভেজা চোখে আগন্তুকের মুখ ভালো করে দেখতে পায় না সে। কী বলে আগন্তুককে সম্বোধন করবে বুঝে উঠতে না পেরে কাশেম ভেজা ঘাসে বসে পড়ে দুহাত জড়ো করে।

—আমি জানি আপনি পাইরবেন। আমি মেলা দূর থেনে আইছি। হিরু কইছে, আপনের অনেক ক্ষমতা। আমার বাড়িত একবার যায়া আমার গেদির শরীরে যদি একটু ফুঁক দিইয়ে

দিতেন। গেদি আমার বিছানায় পড়া। জন্মের থেন বোবা, অবোধ। অত সোমত্ত মাইয়া বিয়া দিবের পারি না।

অপরদিক থেকে কোনো শব্দ আসে না। আগন্তুক নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে তার ঝোলা হাতড়ায়। তাই দেখে কাশেমের কৃতজ্ঞ চোখে চাঁদের ঝিলিক লাগে। বুঝিবা কোনো ওষুধ বের হবে ওই ঝোলা থেকে! কিন্তু না। তাকে অবাক করে চাঁদ কাঁদে। বিরহী সেই কান্নায় চারপাশ ঘোলা হয়ে আসে। ভক্তের মিনতি উপেক্ষা করে ধনুকের ফলার মতো টান টান হয়ে দাঁড়ায় আগন্তুক। তারপর পূর্ণদৃষ্টিতে একবার কাশেমের দিকে তাকায়। অবাঙময় সেই দৃষ্টি পাঠ করে কাশেমের বুকে স্বপ্নের কল্লোল জাগে, এবার বুঝি উপায় হবে। কিন্তু এক ফুঁতে আশার আলো নিভিয়ে দিয়ে হুট করে আগন্তুক হাঁটতে শুরু করে। কাশেমের পা চলে না। ও অবিশ্বাসী দৃষ্টিতে আগন্তুকের চলে যাওয়া দেখে।

শীতরাত্রির হিম ঝরে পড়ে বাতাসে, শুকনো পাতায়। কুয়াশার ঘোরে কাশেমের অচল চোখ ঝাঁ ঝাঁ করে। খেই হারায়। অদ্ভুত সময় এক! একদিকে নাগরিক কষ্টগুলো ঝরাপাতা হয়ে খসে পড়ে, আরেকদিকে কাশেমের মতো মানুষদের চোখের কোণে জমে থাকা নুন জমানো গল্পগুলো অন্ধরাত্রির নিঃসঙ্গতায় গলে যায়। আগন্তুক পথ চলে নিঃশব্দে, নিথর মাটিতে তার পদচিহ্ন গেঁথে যায়। চলতি পথে সে পিছু ফিরে তাকায় না।

কাশেমের চোখে আশার মরীচিকা। ওর বুক বিদীর্ণ করে ভারি একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে যার ভার বইতে না পেরে ওর চোখ ভিজে যায়। ঠিক সেই মুহূর্তে কুয়াশার মাঝে আগন্তুকের অস্তিত্ব মিলিয়ে যায়, ভেজা বাতাসে কেবল তার শরীরের অচেনা গন্ধ লেগে থাকে।

(রচনাকাল: ২০১৮, গল্প সংকলন: ঘুমঘরের সুখ-অসুখ)

মিতালি

১

মিতালির সাথে যখন আমার পরিচয় হয় তখন আমি আপাদমস্তক ভাঙাচোরা একজন মানুষ। উঠে দাঁড়ানোর সামান্যতম শক্তি বা ইচ্ছে আমার ছিল না। গভীর হতাশায় নিমজ্জিত আমি প্রতিমুহূর্তে অনুভব করতাম, এই মধ্যবয়সে বিদেশ বিভূঁইয়ে নারীসঙ্গ বিবর্জিত আমার জীবন অভিশপ্ত। বেঁচে থাকার প্রতি প্রচণ্ড অনীহা এসে পড়েছিল আমার। অথচ মলি আমাকে ছেড়ে চলে গেছে শুনে আমার সহকর্মী পিটার, মার্শাল, রিটা আমাকে কেক উপহার দিয়েছিল। রিটা আমার ঠোঁটে কষে চুমু খেয়ে বলেছিল, 'ডিয়ার, নাউ লিভ লাইক এ বার্ড।' রিটার চুমুতে আড়ষ্ট আমি বলেছিলাম, 'ইটস ঠু ডিফিকাল্ট।'

প্রবাসী জীবনের সবরকম ধাক্কা সামলে যখন নিজেকে গুছিয়ে নিয়েছি তখনই মলি আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল যা মেনে নেয়া আমার জন্য খুব কঠিন ছিল। কিন্তু আমাকে ছেড়ে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় মলিকে দেখে মনে হয়েছিল, ছয় বছরের দাম্পত্যজীবন ওর মধ্যে কোনো পিছুটান তৈরি করতে পারেনি। অথচ একটা সময়ে আমাদের মধ্যে অনেক বোঝাপড়া ছিল। নিউইয়র্ক প্রবাসী বড় ভাইয়ের কল্যাণে বিয়ের বছরখানেকের মধ্যে আমরা দুজন এখানে ইমিগ্রান্ট হয়েছিলাম। বিদেশের হালচাল বুঝে উঠতে না উঠতেই আমার বড় ভাই আহাদ যখন জানিয়েছিল, 'গ্রিনকার্ড আর সোশাল সিকিউরিটি কার্ড হয়ে গেছে, এবার নিজেদের জন্য আলাদা বাসা দেখে নাও' তখনও বুঝতে পারিনি সামনে কতটা কঠিন পথ পাড়ি দিতে হবে।

সেই সময়ে একটি দিন আরেকটি দিনের চেয়ে কঠিন ছিল। প্রতিমুহূর্তে মনে হতো, ল্যান্ড অব অপরচ্যুনিটিতে এসেও দুটি মানুষ জীবনের সব সম্ভাবনা খুইয়ে বসে আছি। মাথামোটা খিটমিটে মেজাজের একজন বাঙালির কাছ থেকে ৮০০ ডলারে এক রুমের বাসা ভাড়া নিয়ে থাকা, রুমরেন্ট যোগাড় করা থেকে শুরু করে নিজেদের মাসকাবারি খরচ নির্বাহের দুর্ভোগসহ প্রচণ্ডঅর্থকষ্টে থেকেছি। মলি আর আমি এখানে সেখানে খণ্ডকালীন চাকরি করেছি। দেশে থাকলে আত্মসম্মানের কারণে যেসব কাজ করতাম না এখানে এসে সেসব কাজ করেছি। বাঙালি বা ভারতীয় রেস্টুরেন্টে কিচেন হেল্পার, ডিশ ক্লিনার, ওয়েটার থেকে শুরু করে ভেন্ডারি পর্যন্ত করেছি। ধীরে ধীরে আর্থিক দুর্দশা কাটিয়ে উঠতে উঠতে মলি আর আমি নিউইয়র্ক জীবনের সাথে খাপ খাইয়ে নিয়েছিলাম, বছর চারেকের মাথায় নিজেদের একটা বাড়িও কিনেছিলাম।

তারপর হঠাৎ একদিন কী হলো আমাকে অবাক করে দিয়ে মলি জানালো, ও আমার সাথে থাকবে না। আমি অবশ্য টের পেয়েছিলাম মলি সব ধরনের ট্যাবু ভেঙে ততোদিনে পুরোদস্তুর আমেরিকান হয়ে উঠেছে। উল্টোদিকে ওর স্ফুলিঙ্গের সামনে আমার দ্যুতিহীনতা বারবার প্রকট হয়ে উঠতো। আমি ছিলাম খুব সাধারণ, আটপৌরে। প্রাণে ভরপুর জ্যাকবকেই বরং ওর পাশে বেশি মানানসই লাগতো। মলি তখন একটা রেস্টুরেন্টে কাজ করতো। সহকর্মী জ্যাকবের সাথে মলির প্রেম, লং উইকেন্ডে মলির বাড়িতে না ফেরা, আমাদের দুজনের মধ্যকার দূরত্ব, মলির বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া... হুট করে কত কী যে হয়ে গেল।

এসব স্মৃতি নিঃসঙ্গ আমাকে তীব্রভাবে বিমর্ষ করে তুলতো। হোটেলের একঘেয়ে কর্মঘণ্টাশেষ হবার আশায় বারবার হাতঘড়ির দিকে তাকাতাম। প্রাণ আনচান করতো; কখন বারে যাবো, নিজের মতো করে খানিকক্ষণ সময় কাটাবো। তখন আমি সবেমাত্র মদ খেতে শিখেছি। তবু কাজ শেষে পেশাদারের মতো জ্যাকসন হাইটসের দ্যা রেড পেনি বারে ঢুকতাম। এই বারে ভেঙে পড়া মানুষদের আনাগোনাই বেশি, ভবঘুরেও আছে। ওয়েটারদের স্বাগত সম্ভাষণ পাবার সাথে সাথে আমার বুকের ছাতি কয়েক ইঞ্চি ফুলে উঠত, সেই ফাঁকা জায়গায় স্কচ ঢালতে ঢালতে আমি নানান রকম মানুষ দেখতাম। এতে প্রশান্তি মিলত কিনা বুঝতাম না। তবে তরল পেটে পড়লে নিজেকে বনেদি কোনো মানুষ

মনে হতো। এদেশে মদ্যপান সংক্রান্ত ট্যাবু নেই। নিজের ঝুঁকি নিজে নিয়ে যে যেই মাত্রা পর্যন্ত যেতে পারে ততোটুকু পান করে।

আমাদের দেশে প্রকাশ্যে প্রেমিকাকে চুমু খেলে নতুবা মদ খেলে লোকে যতোটা নিগৃহীত হয়, এখানে বিষয়গুলো ঠিক ততোটাই সাধারণ। বাঙালি সংস্কারবোধ থেকে প্রকাশ্যে মদ পান করতে প্রথম প্রথম আমার বাধো বাধো ঠেকতো। তবে স্বস্তিকর বিষয় হলো, এখানে মদ্যপ ব্যক্তিকে কেউ অচ্ছুত ভাবে না। অচ্ছুতের সংজ্ঞা আমাদের দেশে বড়ই অদ্ভুত। যা কাঁধে-মাথায় করে আমরা বিদেশ বিভূঁইয়েও বয়ে আনি।

যাহোক আমার জীবনের ক্লান্তিমোচনের নিভুনিভু বাসনার এক শীতের সকালে মিতালির সাথে আমার পরিচয়। আমাদের এখনো দেখা হয়নি, দেখা হবার সম্ভাবনাও শূন্য। মিতালির সাথে আমার পরিচয় ফেসবুকে। পরিচয় না বলে সংযোগ বলা ভালো। আমি কিমিতালিকে আদৌ চিনি বা মিতালি আমাকে? এমনও হতে পারে মিতালি হয়তো মিতালি না, নার্গিস নতুবা শম্পা। আমিও যেমন রবি না, ফরহাদ। তবে আমাদের দুজনের অবস্থান নির্ভুলই আছে। মিতালির বাংলাদেশ, আমার নিউইয়র্ক।

আমি এখন ভালোই আছি। আর্থিক দুরবস্থা কেটে গেছে। আমি একটা আবাসিক হোটেলে কাজ করি, এটা ইউনিয়ন জব। এই চাকরিতে জব সিকিউরিটি আছে। কোনো কারণে আমার চাকরি চলে গেলে ইউনিয়নই দায়িত্ব নিয়ে নতুন চাকরির ব্যবস্থা করে দিবে আর যতদিন চাকরি না হয় নির্দিষ্ট হারে সাপ্তাহিক বেতনও দিবে। আমার বার্ষিক আয়ও এখন ভালো। ডলারের প্রবাহ ভালো থাকলে শরীর-মন চাঙা থাকে, সেই সাথে শরীরের অবদমিত চাহিদাগুলোও নতুনভাবে জেগে ওঠে। বিপরীত লিঙ্গের সাথে কাটানো পুরাতন স্মৃতিগুলো মাঝরাতে কাঁটার মতো শরীরের স্পর্শকাতর অংশে খোঁচা দেয়। মনে পড়ে মলির সাথে উন্মাতাল শরীরী আনন্দে কাটানো দিনগুলোর কথা।

এখন অবশ্য মিতালির সাথে ফেসবুক মেসেঞ্জারে আড্ডা দেবার অদ্ভুত নেশা হয়েছে। আগে বাড়ি ফিরে একাকিত্ব কাটাতে পর্নোভিডিও বা রগরগে কোনো মুভি দেখতাম। এসব এখন ছেলেমানুষি লাগে। তারচেয়ে মিতালির সাথে আড্ডা দেয়া আমার একাকী জীবনকে বেশ উপভোগ্য করে তোলে। আমাদের দুজনের এই আড্ডাবাজির নির্ধারিত কোনো সময়কাল নেই, বিষয়ও নেই। বাংলাদেশের সাথে সময়ের বেশ ভালো পার্থক্য থাকলেও

আমরা দুজন নিশাচর প্রাণীপরস্পরকে সঙ্গ দিই। আমরা প্রেমিকযুগল নই, পরস্পরের প্রতি কোনো আত্মিক বা শারীরিক দায়বদ্ধতাও নেই।

কাজের ফাঁকে রাত জাগা মিতালির এক একটি মেসেজ আমাকে পরম স্বস্তি দেয়। কী খেয়েছো, কী করছো এসব গতানুগতিক প্রশ্ন শেষে আমরা রোজ কোনো হালকা বিষয় নিয়ে রসিকতা করি, কবিতা বা হারানো দিনের গানের লিংক বা কৌতুক শেয়ার করি। মেসেজ করতে করতে হাসি, অভিমান করি। ফেলে আসা আবেগের কথা বলে পারতপক্ষে আমরা আফসোস করি না। নিজেদের নিঃসঙ্গতা মাড়িয়ে তুমুলভাবে বাঁচার জন্য আমরা ফেসবুক আর ভাইবারের আলাপবাকসো জমজমাট করে রাখি। এভাবে পৃথিবীর দুই প্রান্তে থাকা দুজন নিঃসঙ্গ মানুষ মিতালি পাতিয়ে নিঃসঙ্গতাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ভালোই আছি।

মলিও ভালো আছে। সেদিন হোটেলের লবিতে মলিকে দেখেছি, জ্যাকবের গলা জড়িয়ে ধরে গভীরভাবে চুমু খাচ্ছিল। ওকে দেখে আমার বুকের ভেতরে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলেনি, বরং মিতালির কথা মনে পড়ে ওর প্রতি তীব্র শারীরিক আকর্ষণবোধ করছিলাম আমি। দুপুরে লাঞ্চব্রেকে আমার সহকর্মী দীর্ঘাঙ্গী স্বর্ণকেশী ন্যানো যখন অভ্যাসবশত আমাকে হাগ করেছিল তখন ন্যানোর প্রতিও আগ্রহবোধ করছিলাম। পরক্ষণেই আমি আমার সঙ্গমলিপ্সু মনকে তীব্রভাবে ভর্ৎসনা করেছি। যদিও আমি বিশ্বাস করি শরীরতৃষ্ণা পাপ না। আমার সাথে সংসার করেও যখন মলি জ্যাকবের শরীর-সঙ্গে কিশোরী হয়ে উঠেছিল তখনও স্নানস্নিগ্ধ মলিকে দেখে আমি কামার্ত হতাম। এখন যেমন মিতালির সাথে কথোপকথনের বাঁধ ভেঙে গেলে হই।

২

বিজ্ঞাপনটা দেখে হাসির ধকল সামলাতে আমার পাক্কা দশ মিনিট লেগেছে। এর ভেতরে চায়ের কাপ ছলকে দুবার চা পড়ে টেবিল নষ্ট হয়েছে। অফিস সহায়ক বদরুল টেবিল মুছতে মুছতে আমার দিকে সন্দেহের চোখে তাকাচ্ছিল।

—ম্যাডাম, চা কি বেশি গরম?

—চা তো গরমই হয়, বদরুল।

বলতে বলতে আমি অহেতুক হেসেছি। শব্দ করে। অফিসে সাধারণত আমি শব্দহীন থাকি। একটু আগে আমার হাসির শব্দ শুনে পাশের ডেস্কের সুনীল এসে কৌতূহলে জানতে চেয়েছে, 'এত হাসছেন কেন? কোনো মজার বিষয় হয়েছে কি?' জবাব না পেয়ে সে নিজের কাজে চলে গেছে। আমি দেখেছি পুরুষ সহকর্মীদের সাথে এসব নিয়ে আলোচনা করার পরিণতি হয় সেধে শাল নেবার মতো। মুখের আগল খুলে গেলে এদের স্পর্ধা বেড়ে যায়, তখন অকারণ শরীরী ইঙ্গিত না দিয়ে এরা কোনো কথাই বলতে চায় না।

আমি নিজেকে সামলে নিয়ে বিজ্ঞাপনটা রবিকে ফরোয়ার্ড করেছি। রবির কাছে এসব শেয়ার করতে আমার বাঁধে না। এটা একটা আজব বিষয়। আমি সব পুরুষ থেকে কেন ওকে আলাদাভাবে সংজ্ঞায়িত করেছি তা আমি জানি না। শুধু জানি কারো কারো কাছে নিয়ম—নীতির বাঁধ ভাঙলে উপচে ওঠে ভালোলাগার জোয়ার। রবির সাথে আমার সম্পর্ক এখন তেমনই।

রবির ইনবক্সে সবুজ বাতি জ্বলছে। সকালে ও শ্রুতিগোস্বামীর চমৎকার একটা গানের লিংক শেয়ার করেছে। 'তোমায় দেখবে বলে এ ফুল ফুটেছে, তোমায় দেখাবে বলে সূর্য উঠেছে...ও আমার পাতাঝরা বনানীর পাখি, ও আমার সোনাঝুরি বনের একাকী' গানটি শুনতে শুনতে আমি ওর মেসেজের অপেক্ষা করি।

—বিজ্ঞাপনটা দেখো, খুব মজা পাবে।

রবি মেসেজ দেখেছে। ও তবু নিশ্চুপ। আমি উসখুস করি।

—ব্যস্ত নাকি?

—হুম।

—তাহলে থাক। সময় পেলে বিজ্ঞাপনটা দেখো। সকালে এক বন্ধু দিলো ইনবক্সে। দেখে সেই তখন থেকে হাসছি।

—তাই?

—আহা পড়োই না। ব্যস্ত যদি, জবাব তো ঠিকই দিচ্ছো!

'মনোবিজ্ঞানে এম.এ. বয়স ৪৭, ডিভোর্সি, ফর্সা, সুশ্রী, রামকৃষ্ণ সারদা পূজারী একমাত্র মেয়ের ঘরজামাই সুপাত্র চাই, সেক্সে অক্ষম হলেও চলবে।' বিজ্ঞাপনটির ছবির কোণে বুড়ো আঙুল উঁচু করা একটা লাইক ইমো সেঁটে যেতেই আমি আবার হাসিতে ভেঙে পড়ি। যদিও মুখে হাত চেপে হাসিকে শব্দহীন রাখতে হচ্ছে। ওই প্রান্ত থেকে একটা হাসির ইমোটিকন এসে বিজ্ঞাপনের নিচে আছড়ে পড়তেই বোঝা যায় এবার রবিও হাসছে।

—ভালোই তো পাত্র বাবাজির কষ্ট কমে গেল।

—ফাজলামি করো না। অমন স্বামী দিয়ে ভদ্রমহিলা করবে কী বলো তো?

—আহা, আমার তো মনে হচ্ছে মেয়েটা বা তার পরিবার সজ্ঞানেই বিজ্ঞাপন দিয়েছে! হাসিঠাট্টার কিছু নেই। এই বিষয়ের জন্য ভদ্রমহিলার শরীর আর বয়স উপযুক্ত নাও থাকতে পারে।

—তা অবশ্য ঠিক বলেছো। এমনও হতে পারে, প্রথম বিবাহিত জীবনের তিক্ততা তাকে যৌনকর্মে বীতশ্রদ্ধ করেছে। নাহ, হাসিঠাট্টা করা ঠিক হয়নি আমার।

—হাসি আসা তো স্বাভাবিক, তুমি ঠিক কী কারণে হেসেছো সেটাই আসল বিষয়।

—হু। আমি মজা পাচ্ছিলাম পাণিপ্রার্থী পুরুষটির কথা ভেবে। বেচারা।

—হাহাহা।

—সত্যি সিরিয়াসলি ভেবে দেখলে, এদেশে বেশিরভাগ মেয়েই বিবাহিত জীবনে শরীরের সুখ পায় না, কেউ তা স্বীকারও করে না। করবে কী, বিবাহিত নারীদের বেশিরভাগই জানে না শরীরে কী করে সুখ পেতে হয়। আমার ঘনিষ্ঠ বান্ধবীদের অনেকেই বিবাহিত জীবনের পনের-বিশ বছর পার হবার পরেও জানে না অর্গাজম কী। আর একেবারে রুট লেভেলের নারীদের বেশিরভাগই ভাবে শরীরের সুখ একচেটিয়া তাদের স্বামীর জন্যই। আমি ফিল্ডওয়ার্কে গিয়ে অনেক মেয়েদের এমনই পেয়েছি।

—সেটাই। যদিও বিজ্ঞাপনটি পড়ে বোঝা যাচ্ছে ভদ্রমহিলা যৌন-অক্ষম ব্যক্তিকেও বিয়ে করতে রাজি কিন্তু এমনও হতে পারে, তার পরিবার তার জন্য পুরুষ নামের একজন অভিভাবক খুঁজছে শুধু। আমাদের সমাজে একজন ডিভোর্সি নারীর সমাজে স্বাচ্ছন্দ্যে বেঁচে থাকার জন্য যৌনতা, প্রেম-ভালবাসার চেয়েও একজন স্বামী বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে। হোক সে ধ্বজভঙ্গ।

রবির সাথে আড্ডা দিতে দিতে ফুরফুরে বাতাসে আমার মন জুড়িয়ে যায়। এ কারণেই রবিকে আমি অকপটে সব বলতে পারি। হয়তো আমাকে খুশি করতেই রবি ওর পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব সুচারুরূপে আমার কাছে গোপন করে, নিজেকে উপস্থাপন করে দারুণ একজন স্বাধীনচেতা মানুষ হিসেবে। তবু আমি এই সত্য-মিথ্যার ধূম্রজালে ঢাকা ভার্চুয়াল জীবনের এই মিতালি উপভোগ করি। আমি মেসেজের প্রতিউত্তর দেবার আগেই টুং করে নতুন মেসেজ আসে। রবিকে আপাতত বিদায় জানিয়ে আমি কাজে মন দিই। যতক্ষণ কাজে ডুবে থাকি একাকিত্ববোধ মাথা চাড়া দেয় না। আমি একটা আই.এন.জি.ও তে কাজ করি। সারাদিন ব্যস্ততায় কাটে আমার। বাড়ি ফিরে দুটো খেয়ে নিয়ে বিছানায় শরীর ছাড়তেই ঘরজুড়ে থাকা নীরবতা তীক্ষ্ণফলায় আমাকে ঘায়েল করতে মুখিয়ে ওঠে। তখন মোবাইলে থাকা প্রাণভোমরা রবি আমাকে আশ্বস্ত করে।

আমরা দুজন সেই অর্থে প্রেমিকযুগল নই। দুজন পোড় খাওয়া মানুষ একে অন্যের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে ক্ষণিকের জন্য শারীরিক ও মানসিক প্রশান্তি খুঁজছি। এই যে শারীরিক প্রশান্তি, এই বিষয়টাও বড় গোলমেলে। দুটো শরীর পরস্পর লেপটে থাকলেও তা আসে না, আবার বহুদূরের পৃথক দুই ঠিকানায় বসবাস করা দুজন মানুষ শুধু মুখের কথাতেই শরীরী সুখে ভাসাতে পারে। এই যেমন রবির প্রতিটি মেসেজের এক একটি শব্দে উড়ে আসে সুখানুভূতির রঙিন পরাগ। যার সাতরঙ দিন দিন আমার ভালোবাসার কাতর ইচ্ছে জাগিয়ে তোলে। এই এখন যেমন রবির যৌনতাগন্ধী মেসেজ দেখে আমার কানের লতি লাল হয়ে যাচ্ছে, তলপেটে ব্যাখ্যাহীন শিরশিরে একটা অনুভূতি হচ্ছে। আমি টের পাচ্ছি, আমার মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করছে, শরীরের প্রতিটি রোমকূপে আশ্চর্য এক অনুভব লালপিঁপড়ে হয়ে ছোটাছুটি করছে।

এ অনুভূতি আমার অচেনা নয়। এদেশে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে জড়ানো পাপ হলেও লোকচক্ষুর অন্তরালে পাপীর তালিকায় আমার নাম উঠেছিল। তৌহিদের সাথে আমার সম্পর্কটা টেকেনি। বিয়ে পর্যন্ত গড়ানোর আগেই তৌহিদ বুঝতে পেরেছিল আমাকে ওর আর ভালো লাগছে না, আমাদের দুজনের মধ্যে বিস্তর ফারাক। কী আশ্চর্য! তৌহিদের মেসের চৌকির ওপরে তেল চিটচিটে চাদরের আড়ালে দুটো শরীর সব পার্থক্য ঘুচিয়ে ফেললেও সেই কথা বুঝতে তৌহিদের বছর তিনেক লেগেছিল। নাহ, তৌহিদ সেই অর্থে আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। তৌহিদ আমাকে ছুড়ে ফেলার কথা আমার মুখের

ওপর বলেই আমাকে প্রত্যাখান করেছে। এরপর ও আমার বান্ধবী নিশিকে বিয়ে করে মেলবোর্ন চলে গেছে। সেদিন নিশির টাইমলাইনে দেখলাম 'আমার বিড়ালসোনা' ক্যাপশনে দুজনের ছবি দিয়েছে।

আমার আর বিয়ে করা হয়নি। এদেশের হিসেবমতে আমি এতটাই দেরি করে ফেলেছি যে এখন লোকে আমাকে দেখিয়ে আঙুল তুলতেও ভুলে গেছে, 'মিতালি এখনো বিয়ে করেনি।' তৌহিদের সাথে বিচ্ছিন্নতার পর পুরুষসঙ্গের প্রতি আমার তীব্র অনীহা কাজ করতো, নিজের প্রতি অর্থহীন রাগ হতো। কিন্তু রবির সাথে পরিচয়ের পর অদ্ভুত পরিবর্তন হয়েছে আমার। শুধু নিজের কাছে কেন রবির কাছে স্বীকার করতেও আমার দ্বিধা নেই, দীর্ঘবছর খরায় থাকা আমার এই চল্লিশোর্ধ্ব শরীর আজ কোনো পুরুষের কাছে নিজেকে সমর্পণ করার জন্য নির্লজ্জভাবে উন্মুখ হয়ে আছে। ভেতরে ভেতরে আমি হয়তো বুভুক্ষু ছিলাম এমনই কারো আহ্বানের জন্য, যা রবির সাথে যোগাযোগ শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত টের পাইনি। তাই নিজের মধ্যে বিস্তর পরিবর্তন টের পাচ্ছি। যে আমি ভার্চুয়াল জগতের প্রতি নিরাসক্ত ছিলাম সেই আমি এখন মাদকাসক্তের মতো রবির মেসেজের জন্য অপেক্ষা করি। ভাইবার, ফেসবুক মেসেঞ্জারে লগড্ইন থাকি চব্বিশ ঘণ্টা।

অ্যাকটিভ থাকার সবুজ বাতি জ্বলতে থাকলে নানান বিড়ম্বনাতেও পড়তে হয়। গতকাল আমি হানিফ নামের ফালতু একজন লোককে মেসেঞ্জারে তার অহেতুক আগ্রহের কারণে ব্লক করেছি। প্রতিদিন সকালে অযথাই মেসেঞ্জারে সে আমাকে ডাকাডাকি করবে —'আপা, আবার প্রোফাইল পিকচার পাল্টাইছেন! আগেরটাই তো সুন্দর ছিল।' অকারণে উদ্ভট ধরনের কোনো জিআইএফ পাঠিয়ে বলবে, 'খুব নিঃসঙ্গ লাগে।' হারামজাদা, আমার ছবি সুন্দর হোক বা কুৎসিত হোক তাতে তোর কী? আর তোর নিঃসঙ্গ লাগলে আমার কী? আমাকে কী তোর নিঃসঙ্গতা কাটাতে তোর গলায় ঝুলে পড়তে হবে! এদের আমি হাড়েহাড়ে চিনি। এই বুড়ো ভামগুলো বাড়িতে স্ত্রী-কন্যার কাছে দেবতা সেজে থাকবে আর অফিসে বসে সেকেন্ডে সেকেন্ডে ফেসবুকে মেয়েদের প্রোফাইলের ওপর নজর রেখে বিকৃত শরীরী তৃষ্ণা মেটাবে।

কয়েকজনের ইনবক্স নোটিফিকেশন আমি শব্দহীন করে রেখেছি। কিন্তু অভ্যাসবশত দশ/পনেরো মিনিট পরপর ইনবক্স চেক করার কারণে এগুলো ঠিকই নাকের ডগায় এসে ঝুলতে থাকে। তখনই মুখ বিস্বাদ হয়ে যায়। উল্টোদিকে রবির উদ্দেশ্যমূলক মেসেজগুলো

সময়ে-অসময়ে আরক্ত করে তোলে আমায়, ভাসিয়ে নেয় বয়ঃসন্ধিকালের মতো অকৃত্রিম কোনো মাতাল অনুভবে।

৩

মলি ফিরে এসেছে। দরজায় দাঁড়ানো মলির মাথার লাল টুপি আর পরনের কালো ওভারকোটের ওপরে তুষারের শুভ্র স্পর্শ। এই সপ্তাহে নিউইয়র্কে মৌসুমের প্রথম তুষারপাত শুরু হয়েছে। গত পরশু তুষারঝড়ও হয়েছে। গতকাল রাত থেকে অবশ্য আবহাওয়া খানিকটা ভালো। রাতভর ঝিরঝিরে বৃষ্টি ফোঁটার মতো মিহি দানার তুষার পড়েছে। সকালে টয়লেটে যাবার সময় জানালার পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখেছি, বাড়ির সামনের আঙিনা শাদা ধবধবে। সারারাতের অবিশ্রান্ত তুষারপাতে বরফকণা জমে রাস্তার দুই ধার উঁচু হয়ে গেছে।

তুষারপাতের মৌসুম এখন আমার কাছে বিরক্তিকর লাগে। উটকো ঝামেলা মনে হয়। তাপমাত্রা কমে মাইনাসে নেমে এলে রাস্তায় তুষারকণা জমে চলাচল করাই কঠিন হয়ে যায়। যদিও সিটির গাড়ি এসে রাস্তার বরফ পরিষ্কার করে নিয়ে যায় কিন্তু আবহাওয়া খারাপ হলে পিচ্ছিল রাস্তায় গাড়িতে বা পায়ে হেঁটে যাতায়াত করা মানুষের পক্ষে বিপদজনক হয়ে পড়ে। তখন লোক এনে ডলার খরচ করে নিজের বাড়ির সামনের বরফ পরিষ্কার করাতে হয়। এতে বাড়তি খরচ, বাড়তি দুর্ভোগ। আর তুষারঝড়ে আবহাওয়া বৈরী হলে তো দুর্ভোগের অন্ত নেই।

আজ আমার ছুটি। সকালের আয়েসি ঘুম নষ্ট করে বিছানা ছাড়তে মন চাইছিল না। অনাকাঙ্ক্ষিত বেলের শব্দে বিরক্তি নিয়ে দরজা খুলে দেখি মলি দাঁড়িয়ে আছে। ঘরে ঢুকে শরীরের কয়েকপ্রস্থ কাপড় ঝেড়ে ফেলতেই মলিকে দেখতে অন্যরকম লাগছে। শর্ট স্কার্ট আর ঢোলা লাল গেঞ্জি পরিহিত মলি যেন বাগানের সদ্যতোলা স্ট্রবেরি। পরিচ্ছদের সাথে সাথে ওর চেহারাতেও একটা পশ্চিমা ভাব চলে এসেছে। আমাকে পশ্চিমা ঢঙে ‘হাই হানি’

বলে ক্যাজুয়াল ভঙ্গিতে আলিঙ্গন করে মলি ঘরে ঢুকে পড়েছে। ওর পাশে দাঁড়ানো পেটমোটা ট্রলিব্যাগ দেখে বোঝা যাচ্ছিল, থাকার প্রস্তুতি নিয়ে এসেছে।

—উফফ, কী কনকনে ঠান্ডা! নিউজে দেখলাম এ বছর গতবছরের তুলনায় বেশি স্নোফল হবে।

—হুম। ঠান্ডার ভেতরে এই সকালে কী করে এলে?

—কোনো সমস্যা হয়নি। তুমি কেমন আছো?

—ভালো। তুমি?

—মন্দ না।

কথা বলতে বলতে মলি অভ্যস্ত হাতে কফি বানায়। ডার্ক রোস্টেড ব্ল্যাককফির তেতো স্বাদ নিতে নিতে আমি মলিকে দেখি। কতোদিন পর ও এলো? প্রায় দেড় বছর।

—ফরহাদ, তুমি নিশ্চয়ই ব্রেকফাস্ট করোনি?

আমার না সূচক মাথা নাড়ানো দেখে মলি কিচেনে ঢুকে যায়। ওকে দেখে আমার পুরনো জীবন আমার পায়ের কাছে থমকে দাঁড়ায়। কত কী মনে পড়ে! নিউইয়র্কে আসার পর প্রথম যেবার মলি আর আমি তুষারপাত দেখি, মুগ্ধতায় আমাদের দুজনের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কাজ থেকে ফিরে দুজন রোজ ব্যাকইয়ার্ডে বা বাড়ির আঙিনায় পরস্পরকে আলিঙ্গন করে দাঁড়িয়ে থাকতাম। ছুটির দিনে চলে যেতাম বাড়ির কাছের পার্কে। শুভ্রতার জাদুঘোরে আচ্ছন্ন নতুন প্রকৃতি, গাছের পাতাহীন শাখা-প্রশাখায় লেপটে থাকা শাদা শাদা কোমল তুষারের সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে দুজন মেতে উঠতাম নানান ছেলেমানুষি খেলায়।

—ফরহাদ, মাশরুম আছে?

হঠাৎ প্রশ্নে আমি চমকে উঠি।

—না।

—থাক, লাগবে না। ফ্রিজে চিকেন কিউব পেয়েছি। অলিভ অয়েলে একটু টস করে খানিকটা চিলি সস দিয়ে দিয়েছি। চলবে না?

—চলবে, বেল পেপারও আছে। দিতে পারো।

—ওকে। ডান।

আসার পর থেকে মলি এমনভাবে ঘরের কাজকর্ম করছে যে ওকে দেখে মনেই হচ্ছে না যে, ও কখনো এই বাসা ছেড়ে চলে গিয়েছিল। পিজা ট্রেতে তেল ব্রাশ করতে করতে মলি কপালের সামনের উড়ো চুল টেনে কানের পাশে গুঁজে নিয়ে আমার দিকে তাকায়। জিজ্ঞাসা করা শোভন হবে না ভাবলেও আমার মুখ ফসকে প্রশ্নটা বেরিয়ে যায়,

—জ্যাকব কোথায়?

—ও চলে গেছে। মিশেল আর জ্যাকব একসাথে থাকছে। মিশেল স্প্যানিশ, চমৎকার মেয়ে।

এবার মলির গলা সামান্য কেঁপে উঠলো। নাহ, এমনও হতে পারে, আমি ভুল বুঝছি।

—ফরহাদ, আমাকে দেখে তোমার অবাক লাগছে না? নির্লজ্জ মনে হচ্ছে?

কথার প্রসঙ্গান্তরে আমি চমকে গিয়ে কথা খুঁজে পাই না দেখে মলি হাসে। ধূসররঙা হাসিতে মলির মুখটি এই প্রথমবারের মতো ম্লান লাগে। আমি স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করি,

—নির্লজ্জ হবে কেন! এদেশে এসে এটা তো বেশ বুঝেছি, নিজের মনমতো জীবনযাপন করাই ভালো।

—আসলে কী থেকে যে কী হলো। তোমাকে তো কতবার বলেছি, সবকিছুর পরও ভীষণ একা ছিলাম আমি। আর জ্যাকব...

—থাক, এসব বিষয় বাদ দাও। এখন আর এসব ভালো লাগে না।

মলি কাঁদছে। আমার কাছে ও নিজেকে লুকানোর আর কোনো চেষ্টা করে না। ও এবার হাল ছেড়ে দেয়া ভঙ্গিতে ডিভানের ওপর বসে পড়ে। কান্নার দমকে ওর শরীর ফুলে ফুলে উঠছে। আমি কাছে গিয়ে মলির হাতে হাত রাখি।

—কেঁদো না।

আমার মুখে বাড়তি কোনো আবেগের কথা আসে না। মলি জলভরা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে হাসার চেষ্টা করে।

—তুমি পাল্টাওনি। একই রকম নীরস আছো।

টিস্যুতে চোখ-মুখ মুছে নিয়ে মলি স্বাভাবিক হয়। ওভেনে পিজা ঢুকিয়ে সময় ঠিক করে ও আমার দিকে তাকিয়ে হাসে।

—ফরহাদ, তুমি বাসা এত পরিপাটি করে রেখেছো! দেখে মনে হচ্ছে আমার অনুপস্থিতিতে তোমার ঘরে কোনো মেয়ে নিয়মিত আসতো। হাহাহা।

মলির হাসির শব্দে একটা ফিনফিনে শীতল অনুভব আমার শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে যায়। তবু আমি নিজেকে গোপন করি। আমি বলতে পারি না, এখানে...এই ঘরে রোজ চুপিসারে কেউ একজন আসতো, সঙ্গোপনে রেখে যেতো প্রগাঢ় মায়ারেখা, অস্পর্শী সুখের তুষারকোমল অনুভূতি। নিঃশব্দে বলে যেতো কতশত কথা! যে কথার বুদবুদে হয়তো আজও ডুবে যাচ্ছে মোবাইলের অদেখা স্ক্রিন।

আমাকে আনমনা দেখে মলি আমার কাছে এগিয়ে আসে। পুরনো আতিথেয়তায় আমার মাথা ওর বুকের খাঁজে টেনে নিয়ে চুল এলোমেলো করতে করতে আমার কানের লতিতে মিহি কামড় বসায়। আমি শরীরী তাড়নায় উন্মত্ত হয়ে মলিকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলি। মেসেঞ্জারের নোটিফিকেশনের চিরচেনা শব্দ আমাদের ঘায়েল করার আগেই মলি মোবাইলটা ডিভানের নরম ফোমের আড়ালে গুঁজে দেয়। মলির ভেতরে বুঁদ হতে হতে মিতালির পাঠানো অজস্র শব্দরেখা আমার শরীরের রোমকূপে কামনার সুতীব্র কম্পন তৈরি করতে থাকে।

—এই যে রক্তাক্ত পাঁজরে উদাসী হাওয়ার কাঁপন, দুঃখের মতো সজোরে জাপটে ধরা বাহুডোর, থরোথরো মায়াতিথি... সব মিলিয়ে তোমাকে ভালোবাসি বলেই লাল-নীল জখমগুলো তাজা রাখি। কেউ জানে না, আমি জানি—শরীরস্লেটে তোমার এঁকে দেওয়া প্রতিটি ক্ষত উপভোগ করতে করতে প্রতিবার আমার খুন হবার ইচ্ছে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, সেই সাথে উদগ্র হতে থাকে রক্তঘ্রাণ পাবার গোপন বাসনা।

৪

আজও সারাদিন রবির মেসেজ আসেনি। এই মাঝরাত অবধিও না। একটিও না। ইনবক্সের সবুজ টিপ জ্বলজ্বল করছে। জ্বলছে ট্রাফিক সিগন্যালের সবুজ বোতাম, জানান দিচ্ছে—'আমি আছি আমার মতো, তুমি যাও তোমার পথে।' যেন আমি মুক্ত শুধু চারপাশে নির্দয় কাঁটাতার। যে তার ডিঙোতে গেলেই রক্তাক্ত হবো। চোখের নোনাপথ গলে তুমুল

বিস্ফোরণের আশংকায় বুকের জমিন কাঁপছে। শরীরও কাঁপছে আমার! তবে কী এখানেই শেষ!

আমাকে নিঃশেষ করে কিশোরী মিতালি বিষের পেয়ালা হাতে পুরনো মেসেজ হাতড়ায়।

—তুমি এত বিষণ্ন কেন?

—বিষণ্নতা আমার প্রিয়সুখ, আমার বেদনার নোঙ্গর।

—আমার ভালো লাগে না। এই থমথমে গাম্ভীর্য, এই উদাসী দিনযাপন ভালো লাগে না।

—আমার ভালো লাগে। বিষণ্নতা দুর্জয় মেঘের মতো পথের সঙ্গী হয়ে আমার পিছু পিছু হাঁটে। যতদূর যাই, ততদূর মাথার ওপর ছায়া হয়ে থাকে।

—তবে তো অনেক কষ্ট তোমার। সারাক্ষণ বিপন্নতার নদীতে সাঁতরে মরো।

—মরি না। সমুদ্রজলে প্রজাপতি সাঁতার কাটি।

—হুম। আরেক মাইকেল ফেলপস। হাহাহা।

—আরে না, আমি মিতালি। রবি, রণজিৎ দাশের 'ডিপ্রেশন' কবিতাটা পড়েছো? 'যারা আজীবন ফুর্তিতে থাকে, বা থাকতে চেষ্টা করে, তারা একরকমের ক্লাউন। জীবনের সার্কাস-ক্লাউন। তাদের মুখে চিরস্থায়ী আত্মতৃপ্ত হাসি আসলে এক ড্রাগ-খোর মেক-আপম্যান-এর হাতে ঘন সাদা রঙ দিয়ে আঁকা; তারা এক চাকার সাইকেলে চড়ে কেবলই হুমড়ি খেয়ে পড়ে ট্রাপিজ-কন্যার নগ্ন ঊরুর কাছে।'

—বেশ কবিতা তো। এখন তো আমারও বিষণ্নতাকে ভালোবাসতে ইচ্ছে করছে।

—সে কী, তুমি বিষণ্ন নও! তোমার প্রোফাইল পিকচারে মেঘের ছায়া ঢাকা চোখজোড়া তবে কার!

আজ আমি বিষণ্ন নই। বিষণ্ন মিতালি বাটারফ্লাই স্ট্রোকে জলের বুকে ভেসে থাকে। আজ আমি ওপড়ানো গাছ। সাগরপাড়ার শেষ মাথার তিনতলা ভবনের পূর্বপাশের অন্ধকার ফ্ল্যাটের একমাত্র জীবিত প্রাণী মিতালি। এই ঘরে একটি টিকটিকিও নেই, ঘুণপোকাও না। শুধু আজ ছুটির দুপুরে পাশের বাড়ির রাজা এসেছিল চুপিচুপি। রাজা এই তল্লাটে নতুন, পাশের বাসার ইন্দিরা ভাবী রাস্তা থেকে ওকে কুড়িয়ে পেয়ে নিজের বাসায় তুলেছেন। রাজাকে নিয়ে ভাবীর ন্যাকামির শেষ নেই। যখনই বারান্দায় যাই দেখি রাজাকে

কোলে বা পায়ের কাছে নিয়ে বসে আছেন। ওর গলা-মাথায় হাত বুলাচ্ছেন, মুখে চুকচুক শব্দ করছেন। এটাসেটা মুখে তুলে খাওয়াচ্ছেন। আমাকে দেখলেই ইন্দিরা ভাবী মহা আনন্দে হেসে হেসে রাজার গল্প করেন,

—বুঝছেন আপা, কে বলবে রাস্তা থেইকা তুলে আনছি, একেবারে পোষ মাইনা গেছে। আমি উঠতে বললে ওঠে, বসতে বললে বসে। আপনার ভাই বলে, রাস্তার বিলাই ফালায় দাও। হাইগা, মুইতা ঘর নষ্ট করবো। আমি অরে দুইদিন টয়লেটে যাওয়ার ট্রেনিং দিছি। ছোট বড় দুই কাজের ডাক আসলেই রাজা এখন আমাদের মতো টয়লেটে যায়। হেহেহে, বুঝছেন আপা, আদর পাইলে মানুষ কন আর কুত্তা-বিলাই কন সবাই মহব্বতের দাম দেয়।

ইন্দিরা ভাবীর গলার অকৃত্রিম আবেগ আমাকে স্পর্শ করে না। আমি দেখেছি আদরের পোষ্যগুলোই চোর-ছ্যাচ্ছড় হয়; অন্যের বাড়ি ঢুকে চুপিসারে খেয়ে আসে, সে সৃষ্টির সেরা জীবই হোক নতুবা রাজার মতো জীব-জন্তু। এই যে এখন যেমন জানালা খোলা পেলে হুটহাট রাজা আমার ফ্ল্যাটে ঢুকে পড়ে। আজ বজ্জাত হুলোটা ডাইনিং টেবিলে উঠে লাউ-বোয়ালের ঝোল থেকে তুলে মাছ খেয়েছে। আমি হৈহৈ করে তেড়ে গিয়েছি। রাজা ওর তুলতুলে শরীর নিয়ে জানালা গলে পালিয়েছে। বাটি সুদ্ধ তরকারি ময়লার ঝুড়িতে ফেলেছি আমি। বিড়াল আমার চিরশত্রু। দুচোখের বিষ।

তৌহিদ বিড়াল ভালোবাসতো। আমার বুকের ভাঁজে মুখ ঘষে হ্যাংলা বিড়ালের মতো মিউমিউ করতো। সুযোগ পেলে নখের আঁচড় বসাতো গালে-হাতে-বুকে-নাভীমূলে-উরুসন্ধিতে। কোনো পুরুষের শরীরসর্বস্ব আকাঙ্ক্ষার কথা ভেবে এই মুহূর্তে আমার শরীর-মন জুড়ে তুমুল বিতৃষ্ণা জাগছে। মনে হচ্ছে, এই পৃথিবীর কাছ থেকে আমি প্রচণ্ডভাবে প্রতারিত হয়েছি।

আমি তো একাকী ভালোই ছিলাম। রবি আমাকে নতুন করে পুরনো সব অনুভবের চোরাস্রোতে টেনে নামিয়েছে। কিন্তু শরীরের প্রতি অঙ্গে আমার কি কোনো গোপন বাসনা লুকানো ছিল? তাহলে রবিকে কেন একা দোষারোপ করছি? নিজের মনের বিপরীতমুখী অবস্থানে এই মাঝরাতে আমার খুব অসহায় লাগে। সত্যি, রাতের অন্ধকারে বিপুল পৃথিবীতে নিজেকে একা আবিষ্কার করার মতো দুর্বিসহ যন্ত্রণা বোধহয় দ্বিতীয়টি নেই। এই যে বুকের তেপান্তরে দস্যি ঘোড়া ছুটে চলে এলোমেলো; খুরের আঘাতে ক্রমাগত খুঁড়ে

চলে বিজন প্রান্তর, যন্ত্রণার তীব্রতায় কেবল মনে হয় কত শতাব্দী ধরে আমি একা আছি! সঙ্গীহীন, স্পর্শহীন।

আমি টের পাই কদিন ধরে আমার দুর্যোগ বাড়াতে অন্ধকার ফুঁড়ে রাজা আসে। আজও এসেছে। রাজা বড় নিঃশব্দে হাঁটে। ঘরের মেঝেতে রাজার সাবধানী পদচারণা টের পাই। রাজার সবুজাভ চোখ অন্ধকারে জ্বলজ্বল করছে। আমি 'যা' 'যা' বলে ওকে তাড়াবার চেষ্টা করি। কিন্তু ঘরের সবুজ আলো নেভে না। অন্ধকারে সেই আলো দেখে বড় বিপন্ন লাগে।

কে? রাজাই তো? না কিতৌহিদ? রবি নয় তো?

এবার প্রাণীটা এক লাফে আমার বিছানায় উঠে বসে। আমি ধড়ফড় করে উঠতে গিয়ে টের পাই ও আমার বুক পর্যন্ত চলে এসেছে। ওকে টেনে হিঁচড়ে বুকের ওপর থেকে সরাতেই ও আমার জামা খামচে পেট বরাবর নেমে আসে। চারপেয়ে ধূসররঙা রাজা! রাজা আমার নাভিমূল খামচে ধরেছে, আমি যতোই ওকে বাধা দেবার চেষ্টা করছি ও ততোই আমার শরীর খুঁড়ে চলেছে। ওর মুখে আহ্লাদী ঘরঘর শব্দ কানে আসতেই এবার আমি পাগল হয়ে যাই। হৈ হৈ করে উঠে বসে এক ঝটকায় হুলোটাকে অন্ধকারে ছুঁড়ে ফেলি। তারপর বিভ্রমের খোল ভেঙে বের হয়ে আসতেই প্রগাঢ় একটা ভয় আমাকে ঘিরে ধরে।

আমি ঘেমে একেবারে নেয়ে উঠেছি। বেডসাইড টেবিল থেকে বোতল নিয়ে ঢকঢক করে অনেকটা পানি খেয়ে যান্ত্রিক ভঙ্গিতে মোবাইল হাতে তুলে নিই। রবি কোথায়? ওর সাথে কথা বলার ইচ্ছের তীব্রতা আবার আমাকে রক্তাক্ত করে তোলে।

রবির মেসেজ এসেছে কিনা চেক করার আগে ফেসবুক নোটিফিকেশনে চোখ যায় আমার। ও প্রোফাইল পিকচার পাল্টেছে। আমি স্থিরদৃষ্টিতে রবির প্রোফাইল পিকচারের দিকে তাকিয়ে থাকি, চমৎকার একটি যুগলছবি। রবি মলি হোসেন নামের একটি মেয়েকে ট্যাগ করে ফটো অ্যালবাম শেয়ার করেছে। ত্রিশটি ছবি। আমি একে একে সব ছবি দেখতে থাকি। রবি আর একটি মেয়ে পরস্পরের দিকে বরফের বল ছুড়ছে, দুজনে গালে গাল লাগিয়ে উষ্ণতা ভাগ করে নিচ্ছে, একসাথে বরফের আইসক্রিমে কামড় দেবার ভঙ্গি করছে...অপূর্ব সব স্থিরচিত্র!

আমি মুগ্ধ হয়ে দেখি, ঐ ভিনদেশ আসলেই সুন্দর। সেই সুন্দরে দুজন পৃথিবীবিচ্ছিন্ন মানুষ বিভ্রমের ঘোরে বন্দি। আমি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে ছবিগুলো দেখতে থাকি। দশ মিনিটের

মধ্যে রবির ফটো এ্যালবামে একশো লাইক আর বিশটা কমেন্টস পড়েছে। ছবিগুলো দেখতে দেখতে আমার চোখ জ্বালা করে। টের পাই আমার ঠোঁটের কোণে হাসির ফুলকি। এই হাসি আমার জীবনের মতো নির্জন। সেই নগ্ন নির্জনে মগ্ন হতে হতে আমি কম্পনহীন হাতের স্পর্শে রবিকে আনফ্রেন্ড করে দিই।

(রচনাকাল: ২০১৮, গল্প সংকলন: ঘুমঘরের সুখ-অসুখ)

মইওর বিবির ময়ূর

১

দেখতে দেখতে ময়ূরটা কী করে পুরুষের আদলে বদলে গেল মইওর বিবি জানে না। চোখে ধান্দা লেগে গেছে তার। শরীরে কাঁপন ধরেছে, হাড়েহাড়ে ঠকঠকানি আওয়াজ হচ্ছে। মইওর বিবির পায়ের হাড়েগোড়ে এমনিতেই মড়মড়ানি ব্যথা। ব্যথার কারণ মনে করতে চায় না সে এখন। সে এখন ময়ূরের সন্ধানে আছে। রোম দাঁড়ানো কৌতূহলে মইওর বিবি লতা-পাতার ঝোঁপের আড়াল থেকে হাতিশুঁড়ের পুষ্পদণ্ডেরমতো মাথা বের করে আছে। পেছন থেকে কলাপাতা রঙের শাড়িতে ঢাকা তার ঢেউ তোলা নিতম্ব দেখে মনে হচ্ছে এটি কোনো গাছের সুডৌল কাণ্ড। জঙ্গলমুখী হলে বেছে বেছে এই রঙের শাড়িই পরে মইওর বিবি। গাছগাছালি থেকে যেন তাকে আলাদা করা না যায় সেজন্য তার চেষ্টার কমতি নেই কোনো।

এক ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হাঁটুর ব্যথাটা ঝনঝনিয়ে ওঠে মইওর বিবির। গতকালও স্বামীর হাতে ধুপুরধাপুর মার খেয়েছে সে। পুবপাড়ার বড় মসজিদের মৌলভী সাহেব গত জুম্মাবারে দাওয়াত খেতে এসে পর্দার আড়ালে দাঁড়ানো মইওর বিবির জোড়া পা লক্ষ্য করে বলেছে, স্বামী শরীরের যে যে অঙ্গে হাত তোলে সেই সেই অঙ্গ বেহেশত যায়। ও কথা ছোটকালে মক্তবের ছোট হুজুরও বলতো। ওস্তাদের মার খেলে, ওস্তাদকে হাতাতে দিলে ছাত্রীর শরীরের বিশেষ বিশেষ অঙ্গ বিনা হিসাবে জান্নাতে যায়। এই জনমে যত মার খেয়েছে মইওর বিবি, তাতে তার পুরো শরীরই জান্নাতে যাবার কথা।

জান্নাত পাওয়া না পাওয়া নিয়ে অত মাথা ঘামায় না সে। দুই দুইটা সংসারজীবনে সন্তানসুখই পেলো না যে মানুষ, তার আবার জান্নাত পাওয়ার শখ থাকে নাকি। শখ থাকে তো কেবল বুড়ো মুকিমের মতো পুরুষমানুষের। নরম শরীর দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়ো। রাতে বিছানায় তো দিনে উঠানে। কোনো বেলা বাদ যেতে দিবে না মানুষটা। আগের বউটা এই করে করেই তো মরল। প্রথম বউ দুঃসম্পর্কের চাচাতো ভাইয়ের হাত ধরে পালিয়েছিল বলে পরেরবার দেখেশুনে কচি মেয়ে বিয়ে করেছিল মুকিম। সে মেয়ে তখনো ছি কুতকুত খেলে। মইওর বিবির বাপের বাড়ির তিন বাড়ি পরেই তাহেরাদের বাড়ি। বিয়ের দিন মইওর বিবিই শাড়ি পরিয়ে ছিল তাহেরাকে। শরীরই ফোটেনি মেয়ের, বুকে কেবল বকুল ফুলের গুটি এসেছে। দুই পেটিকোট পরিয়ে বিয়ের কন্যাকেশাড়ি পরিয়ে ছিল মইওর। ভয়ে সিঁটকে লেগে ছিল মেয়ে। তা অত ছোট শরীর নেকড়ের থাবার সামনে দাঁড়াবে কী করে? প্রথম রাত থেকেই রক্ত পড়া শুরু হয়েছিল তাহেরার গোপনাঙ্গ দিয়ে। আজিনা বলেছে, ঐ শয়তান যতবারই উপগত হয়েছে ছোট শরীরটা আতংকে চেপে শক্ত হয়ে গেছে ততোবার। শেষপর্যন্ত পুঁজ হয়ে গিয়েছিল দুর্গম সেই প্রবেশপথে। মুকিমের কীর্তিকাহিনি ফাঁস হয়নি। এসব লজ্জার কথা কি কাউকে বলা যায়? তাই এ-কান ও-কান হয়ে পাঁচ কান হওয়ার ভয়ে কবিরাজ বাড়ি গিয়ে ওষুধ এনে তাহেরার চিকিৎসা করিয়েছে সে। এভাবে দিন বিশেক পার হলেও শেষরক্ষা হয়নি। মেয়েটা মরে গিয়ে বেঁচেছিল। এদিকে গ্রামে রটেছে মুকিমকে অসুইখ্যা মেয়ে গছিয়ে দিয়েছে তাহেরার বাপ। এসব কাহিনি বিশ্বাস না করলেও মইওরের বাপ মুকিমের ঘরে পাঠিয়েছিল মেয়েকে। নয়তো কে বিয়ে করতো তালাকপ্রাপ্তা ধামড়ি মেয়েকে?

মইওর বিবিও কম যায় না। এসব মারধরে গা করে না সে। মুকিম মারতে এলে পিছলে পিছলে যায়, খিস্তি-খেউড়ে একাকার করে। 'হাড়গিলা শয়তান' বললেই বাটিঘটি যা পায় নিয়ে কুঁদে মারতে আসে মুকিম। বেশিরভাগ সময়ই ব্যর্থ হয়। মাঝেমাঝে দুএকটা মার বেকায়কা লেগেও যায়। একদিন মারলে মইওর বিবি দুদিন শরীরে হাত দিতে দেয় না বুড়োকে। ইনিয়েবিনিয়ে দুল, চুড়ি কিনে এনে দরজা খোলায় তখন বুড়ো। এরপর বুড়ো হাড়ের খেল দেখাতে গিয়ে দম যায় সুদের কারবারি মুকিমের। মনে হতেই মইওর বিবির হাসি পায়। বুড়ো এখন হাত-পা চেগিয়ে ঘুমাচ্ছে। বিবি কোথায় কী করে বেড়াচ্ছে কোনো খবরই নেই।

এদিকে সূর্য চোখ না মেলতেই ফরজ গোসল সেরে জঙ্গলে ঢুকেছে মইওর বিবি। সেই কখন থেকে নোনাধরা দেবমন্দিরের আশেপাশে উঁকিঝুঁকি মারছে। কার্তিক মাসের মাঝামাঝি এখন। প্রথম সকালের হিম লেগে আছে পাতায় পাতায়। সূর্য ঠিকরে পড়া আলো গাছ-গাছালির শাখা-প্রশাখায় জাদুকরী বিভ্রম তৈরি করছে। সবে হিন্দুদের দূর্গা পূজা শেষ হয়েছে। এ মন্দিরে পূজা হয় না। পরিত্যক্ত মন্দিরটা আটিয়াটারির এই দিকটায় গা ছমছমে একটা পরিবেশ তৈরি করেছে। মইওর বিবি ছোটবেলা থেকে শুনে আসছে অপঘাতে পুরোহিতসহ একাধিক দর্শনার্থী মরে ছিল কোন কালে তখন থেকেই পূজা-আর্চনা বন্ধ এখানে। সচরাচর কেউ আসে না এদিকে। মইওর বিবি বিশেষ কারণে প্রতিদিন এখানে ঘুরঘুর করে।

খসখস খসখস শব্দ হচ্ছে। সতর্ক হয় মইওর বিবি। আবার সবুজ রং ঘুরতে শুরু করেছে। ভুল দেখেছে সে। কোনো মানুষ না। এ ময়ূরই। সবুজ পালক ফুলে ফুলে উঠছে ময়ূরের। পেখম ছড়াবে কি? মইওর বিবি শুনেছে সঙ্গিনীকে না দেখলে পেখম ছড়াবে না পুরুষ ময়ূর। গাছের আড়াল ভেদ করে ডোরাকাটা রোদ পড়ছে ময়ূরের ওপর। চিকচিক করছে ওর মসৃণ শরীর। কাছেপিঠে কোথাও পাখি ডাকছে। সতর্ক হয়ে উঠছে প্রাণীটা। মইওর বিবিও সতর্ক হয়ে ওঠে। যে করেই হোক আজ সে দেখে নিবে শেষটা।

২

বাড়ি ফিরে মইওর বিবি দেখে বিরাট গোল বেঁধেছে। মালসায় ঢাকা দিয়ে রাখা লবণ-হলুদে জ্বাল দিয়ে রাখা নলা মাছে বিড়াল মুখ দিয়েছে। মালসায় চাপা দেওয়া সরা কে সরালো তার কার্যকারণ খুঁজতে না খুঁজতেই বিবির দিকে তেড়ে আসে সুদখোর মুকিম।

—অই ব্যাডা ঢলানি মাগী...সকাল সকাল কই গেছিলি। তোর বাপের কামাই খাইনি হ্যাঁ...মাগী তোর বাপের কামাই খাই? রক্ত-পানির কামাই আমার।

মইওর বিবির দিকে ছুটে আসা মালসা আছড়ে পড়ে মাটির উঠানে। মাছের হলুদ টুকরোগুলো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যায় উঠানে। মাছের আধসিদ্ধ মাথা পা দিয়ে পিষে মাটিতে

মিশিয়ে দিতে থাকে মুকিম। হৈ হৈ করে ঘর থেকে ছুটে আসে মুকিমের বোন আজিনা।

—অই খাওনের জিনিসে পা দ্যাছ কে তুই? রুটিরুজির বরকত থাকেনি?

আজিনা ছুটে এসে মাছের টুকরাগুলো তুলতে থাকে।

—বরকত আছেনি এই সংসারে, ঐ বেটি যেইদিন পা দিছে এই বাড়িতে সেইদিন থেইকাই বরকত শ্যাষ। এক বিষ ঝাইড়া আরেক বিষ শইলে তুলছি। আইজই তোর বাপরে ডাকুম, যার মাল সে নিয়া যাক।

বাপের নাম শুনে আর স্থির থাকে না মইওর বিবি। মাটিয়ে লুটিয়ে পড়া দেহ এক ঝটকায় ঝেড়ে তোলে। মুখে কিছু বলে না। বিবির দৃষ্টিতে শুধু ঘায়েল হতে থাকে মুকিম। এক ঝটকায় নিজেকে সামলে সে বড় ঘরের দরজায় পাশে দাঁড় করানো ডাঁশা হাতে নিয়ে তেড়ে যায় বিবির দিকে। এক ছুটে গিয়ে ভাইয়ের সামনে থেকে ভাবীকে সরিয়ে নেয় আজিনা। রাতভর জেগে সকালে বেহুঁশের মতো ঘুমিয়েছে আজিনা, রান্নাঘরে অনিষ্ট হচ্ছে টের পায়নি।

—তোরও খুব বাড় বাড়ছে আজিনা। এই মাগীর লগে মিইশা তুইও একটা...।

আরও খানিকক্ষণ চোটপাট দেখিয়ে হাড়গিলা শয়তানটা বাড়ি থেকে বের হলে মইওর বিবি আজিনার কাছে ময়ূরের কথা পাড়ে। এ বাড়ি এসে আজিনার কাছ থেকেই ময়ূরের বৃত্তান্ত জেনে ছিল মইওর বিবি। প্রথম প্রথম বিশ্বাস করেনি। একদিন দেবমন্দিরের ময়ূর আজিনাও নাকি দেখেছিল এক ঝলক। দেখে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। সেদিন কে ওকে বাড়িতে রেখে গিয়েছিল তার রহস্যভেদ হয়নি আজও। এই এতটুকু গল্প এত লম্বা করে করে রোজ একবার শোনে মইওর বিবি। শরীরী কসরৎ সেরে বুড়ো ঘুমালেই বিছানা ছেড়ে সে আজিনার ছোট ঘরে ঢোকে। ছোটকালের গল্পের নেশা কাটেনি মইওর বিবির। বুজির কাছে চান সওদাগরের এক গল্পই শুনেছিল হাজারও বার। পান চিবানি মুখে বুজি গল্প বলতো আর চোখের পানিতে বালিশ ভেজাতো মইওর বিবি।

হায়রে সে কী দুঃখ সওদাগরের ছোট বিবির! সতীনের হাতের পানি খেয়ে পানির সঙ্গে সাপের বাচ্চা পেটে ঢুকেছিল ছোট বিবির। সেই সাপের বাচ্চা বড় হয়, ছোট বিবির পেটও বড় হয়। বাণিজ্য সেরে চান সওদাগর বাড়ি ফিরে অসতী অপবাদে ছোট বিবিকে ত্যাগ করে। ছোট বিবির দুঃখে বনের সব প্রাণী কেঁদে মরে। শেষ পর্যন্ত এক সবুজ ময়ূর ছোট

বিবির সঙ্গী হয়। খুঁটে খুঁটে ছোট বিবির জন্য বীজ, ফল, শস্যদানা আনে। দু'হাতের আজলায় পোয়াতি ছোট বিবি শস্যদানা তোলে আর কেঁদে কেঁদে গান গায়,

ও ও রে চান সওদাগর করলা তুমি কি,

ভাইগ্যদোষে তাড়াইলা তুমি ঘরের লক্ষ্মী...।

ছোট বিবির দুঃখে সবুজ ময়ূরের চোখেও দুঃখের অশ্রু ঝরে। দুঃখে দুঃখে কাটাকাটি হয়ে দুজনের মধ্যে গভীর ভাব হয়। একদিন ঘুমভাঙা সকালে ছোট বিবি দেখে; পাতার কুটিরে তার পাশে শুয়ে আছে অপূর্ব সুন্দর এক কুমার, ছোট বিবির পেটের ভার নেমে গেছে, পুরো বিছানায় ছড়িয়ে আছে মখমলি ময়ূর পালক।

সবুজ ময়ূর দেখার লোভে মইওর বিবি আজিনাকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়েছিল মন্দিরের কাছে। আজিনা ওকে এগিয়ে দিয়েই পড়িমরি করে ছুটেছিল। আজিনা সবকিছুতে অমনই ভয় পায়। ভাইকেও ভয় পায় ভীষণ। আজকাল তবু মইওর বিবির কারণেই মাঝেমাঝে চোখ তুলে তাকায় ভাইয়ের দিকে। স্বামীর ঘর করতে পারেনি, সতীনের মার খেয়ে ভাইয়ের কাছে আশ্রয় নিয়েছে তাই মন ছোট করে রাখে অহর্নিশি। মইওর বিবি ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে ওর ভেতরে কোণঠাসা হওয়া মানুষটাকে জাগায়। দুজনকে একসঙ্গে দেখলেই আজকাল তেতে ওঠে মুকিম, 'দুই মাথা এক হইয়া শয়তানি বুদ্ধি করতাছে।'

—তুই তো গেলি না। এই পরথম মইয়ূরের দেখা পাইলাম। কত যে সোন্দর!

বলতে বলতে চোখ বন্ধ করে অস্থির মইওর বিবি। চোখের সামনে দেখতে পায় দেবমন্দিরের সবুজ ময়ূর। ঘাড়-পিঠ বেয়ে যার সবুজ রং গলে পড়ছে। মুখের নীল-হলুদ চামড়া অদ্ভুত এক আলো খেলছে।

—কী হইলো তোর?

আজিনার ধাক্কায় ধ্যান ভাঙে মইওর বিবির।

—কাইল আরেকটু সকাল সকাল যামু।

—ভাই খবর পাইলে তোরে ছ্যাঁচবো।

—এমনিতে মনে কয় কম ছ্যাঁচে?

মাঝেমধ্যে মইওর বিবির ইচ্ছে করে বুড়ো হাড়গিলাটাকে মেরে ফেলে। শয়তানটার অণ্ডকোষেরডগাটা সুপারি কাটার যাঁতি দিয়ে কাটে কচ করে কিংবা এক নম্বর ইট দিয়ে

সেটা থেঁতলে দেয়। ভাবতে ভাবতে কোনদিন এর কোনো একটা কাজ করে ফেলে তার ঠিক নেই। এ কথা আজিনাকে বলতেই থরথর করে কাঁপতে শুরু করে সে, ভাই মরবে সে কারণে না। রক্ত সহ্য করতে পারে না আজিনা। এমনকি মাছের রক্তও না। মুরগি জবাই দিলেও ঘরে গিয়ে দুয়ার দেয়।

—বিষ খাওয়াইলে রক্ত বাইর হয় না।

আজিনার কথা শুনে মইওর বিবি হেসে গড়িয়ে পড়ে।

—তুই তো একটা আস্ত শয়তানরে।

আজিনা কালো মাড়ি বের করে আকর্ণ হাসে।

—আর তুই শয়তানের সই। আমার ভাইরে মারার শলা আমার লগেই করোস। ময়ূরের ঢক দেইখা দিশা নাই তোর।

এবার আরও রং চড়িয়ে আজিনাকে ময়ূরের রূপের বিবরণ শোনায় মইওর বিবি। প্রাণের সখী আজিনার কাছে সকালের ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিলেও ভুলেও এক ঝলকে দেখা বিপুল সম্ভারের গোমর ভাঙে না সে।

৩

ঘুরে ঘুরে সুদাসল তুলে বাড়ি ফিরে এসে একদিন অসুখে পড়ে মুকিম। বিবির কাছে গোপন অসুখের কথা গোপন করলেও বিছানায় কাবু স্বামীর মুখের বাক্সময় যন্ত্রণা দেখে সব জেনে যায় মইওর বিবি। কালিঢালা অন্ধকার রাতে টাট্টিখানায় গিয়ে মাগো মা মাগো মা করে মুকিমকে কাতরাতে শুনে মইওর বিবির মনে ফুর্তি জাগে। এক নম্বর ইট দিয়ে হাড়গিলা শয়তানটার অণ্ডকোষ থেঁতলে দেয়ার গোপন বাসনা অলক্ষ্যে পূরণ হতে দেখে মনে মনে তার আফসোসও হয়, কাজটা সে নিজের হাতে করতে পারল না।

সংসারের কাজকর্ম সেরে এখন নিশ্চিন্তে ঘুমাতে যায় মইওর বিবি। আজকাল শুধু চোখে না, ঘুম নামে তার শরীর জুড়ে। সব জ্বালা জুড়িয়ে গেছে, মাধুর্যেডুবে গেছে রাতের নির্জনতা। মুকিমের বর্বর স্বর কান পর্যন্ত পৌঁছাতে না পৌঁছাতেই মন্ত্রবলে ঘুমিয়ে যায়

মইওর বিবি। এমন সব উপভোগ্য রাত আর আসেনি তার জীবনে। সোনার কাঠি রূপার কাঠি অদল-বদল হলে রাত ফুরায়। মইওর বিবিও আত্মহারা হয়। আলুক্ষেতের আল ডিঙিয়ে ঘন হয়ে আসা গাছগাছালি, ঘাস, আগাছা পেরিয়ে মুকিমের নিকে করা বউ একাকী দেবমন্দিরের দিকে যায়। যখন বাড়িমুখো হয় মইওর বিবি, তার পায়ের আওয়াজও শোনা যায় না।

আজও জীবন না মরণ নিয়ে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসেছে মইওর বিবি তা তার নিজের কাছেও অনির্ণীত থাকে। ছুটতে ছুটতে বাড়ি এসে বড় ঘরের বদলে ছোট ঘরে দুয়ার দেয় সে। পাশের ঘরে শুয়ে-বসে মুকিম কোঁকায়। শুভাকাঙ্ক্ষীরা বলেছে, কবিরাজি চিকিৎসায় কাজ হবে না। সদরে নিতে হবে। বিষয়টা নিয়ে মুকিমের সঙ্গে শলা করতে এসেছে এক বন্ধু। কিছুটা ধাতস্থ হয়ে আজিনাকে ঘরে দেখতে না পেয়ে মইওর বিবি বাইরে আসে। লাফিয়ে লাফিয়ে বেলা উঠছে।

সত্যিই ঘরের কাজে মন নেই মইওর বিবির। ঘরবন্দিমুকিম সেই অপবাদ দিতে কোনো অবসর নেয় না।

—ফুর্তি লাগছে মাগীর। একবার উইঠা খাড়াই। দিমু নে বিষদাঁত ভাইঙা।

দেখতে দেখতে মাস পেরিয়ে যায়। উঠে দাঁড়ানোর সক্ষমতা আসে না মুকিমের। তাই নিয়ে বাড়ির অন্য দুইটি প্রাণীর কোনো ভ্রুক্ষেপ আছে বলে মনে হয় না। তারা দুই সখী একসঙ্গে খায়-দায়, পরস্পরের মাথার উকুন বাছে, রঙ্গরসিকতা করতে করতে একে-অপরের দেহে ঢলে পড়ে। শুধু সকাল হলেই মইওর বিবি একা হয়ে যায়। নিশ্চুপে বিছানা ছাড়ে। দিনে-রাতে এখন তার অখ- অবসর, কেবল ভোরের সূর্য আকাশে ছড়িয়ে পড়ার আগের মুহূর্তটুকুতেই তার ব্যস্ততার শেষ নেই। কী ঘোরে মইওর বিবি ময়ূরের খোঁজে ঘুরে বেড়ায় কেউ জানে না। সে নিজেও জানে না।

আজ কার্তিকের শেষ। সূর্যের আলোর চক্র ঘুরতে শুরু করেছে কেবল। দেবমন্দিরের ভেজা দেয়ালে আলোর বিচ্ছুরণ হয়নি এখনো। মন্দিরের বাইরে সঘন সবুজে কম্পন দেখা যায়। আহারে... বুজির রূপকথা খুঁজতে খুঁতে ওখানে মরতে গেছে মইওর বিবি। রূপকথার ময়ূর আজ নেমে এসেছে মাটিতে, মইওর বিবির সঙ্গে তার খুব ভাব হয়েছে।

আজও চোখের নিমিষে ময়ূরটা পুরুষের আদলে বদলে গেছে। এমন সুঠাম দেহের পুরুষ কখনোই দেখেনি সে। ময়ূর পেখমের বেগুনি চক্র তার দুই চোখের মণিতে।

পুরুষটি হাতের জোর বাড়াতেই মইওর বিবির শ্বাস-প্রশ্বাস গাঢ় হতে থাকে, সে ভুলে যায় সে মুকিম উদ্দিনের নিকে করা বউ। দেনমোহর পঞ্চাশ হাজার এক টাকা, এক হাজার টাকা মূল্যের নাকফুল ওয়াশিল। ডানার ঝাঁপ খুলে মইওরকে নিজের শরীরের আড়ালে লুকিয়ে ফেলে। কোনো মানুষ ছোঁয় না তো যেন হাওয়া ছোঁয়। কার্তিকের হিম পাওয়া হাওয়া। আলিঙ্গনে জড়াতে জড়াতে মইওরকে তেজী সাপের মতো দংশন করে জোড়া পুরু ঠোঁট। মরে যাওয়ার বদলে গলে গলে যায় মইওর, বুকের ছলাৎ ছলাৎ শব্দে শরীর ভাঙে। যেন সে কুমারী নারী, এর আগে কেউ স্পর্শ করেনি তাকে।

দুজনের শরীরের ঘায়ে মন্দিরের দেয়াল ফুঁড়ে বের হওয়া লতাগুল্ম থেঁতলে যাচ্ছে। ক্ষীরই গাছের ডাটা ভেঙে দুধ বের হচ্ছে। মইওর বিবির খোঁপা ভেঙেছে। তার আলুথালু চুলে, নগ্ন শরীরে সবুজ-সাদা রঙের ছোপ লেগে যাচ্ছে। কিছুই খেয়াল করছে না সে।

সবুজের দুর্গ ভেদ করে যখন মইওর বিবি বাড়ির পথ ধরে তখন মুকিম আজিনাকে বাগে পেয়ে চড়-থাপ্পড় মারছে। উঠানে পা দিয়ে দৃশ্যটা দেখে কী করবে সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয় মইওর বিবি। রান্নাঘরে রাখা জলচৌকিটা তাকে নিশানা করে বিবিকে ছুঁড়তে দেখে মুকিম ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে ঘরের ভেতর ঢোকে।

—আইজ থেইকা ভাত বন্ধ দুইটার। একটা টাকাও দিমু না আমি। নষ্ট মাইয়ামানুষ।

—তোর সুদের টাকা লইয়া কব্বরে যা হাড়গিলা শয়তান।

কবরের নাম শুনে যেন নিজের ধ্বজভঙ্গ অণ্ডকোষের মতো চুপসে যায় মুকিমউদ্দিন। বড় ঘরের অন্তরালে থাকা বড় মানুষটার গলা থেকে আর কোনো আওয়াজ আসে না।

৪

রাতে ভালো ঘুম হয়নি মইওর বিবির। অণ্ডথলির শিরা ফুলে গেছে মুকিমের। চিকিৎসা নিতে সদরেও যায়নি সে। কবিরাজ বাড়িতে ডেকে এনে দরজা বন্ধ করে কীসব চিকিৎসা নিচ্ছে। রাতে ব্যথায় মুকিম এমন কান্না জুড়েছিল যে অনেক চেষ্টা করেও দুচেখের পাতা এক করতে পারেনি মইওর বিবি। আজিনার ঘরের দরজায় কয়েকবার টোকা দিয়েছিল,

দরজা খোলেনি। কয়েকদিন ধরে বড় ঘরের মেঝেতেই নিজের বিছানা পাতে সে। রাতে বিবিকে ঘরে না দেখলে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে বিছানা থেকে নেমে বিবির গুষ্টি উদ্ধার করে। কাল রাতেও বিবির সঙ্গে হাতাহাতি করেছে সে, এই শরীরে চড়-থাপ্পড় মারার চেষ্টা করেছে। মইওর বিবিও ছেড়ে দেয়নি স্বামীকে। ঝগড়াঝাটি-মারামারির এক পর্যায়ে মুকিমের ব্যথার জায়গায় লাথি বসিয়েছে। লাথি সুবিধামতো না লাগলেও আতংকগ্রস্ত মুকিম কাঁদতে শুরু করেছিল। মইওর বিবির শ্রান্ত চোখে ঘুম নেমেছিল সুবহে সাদেকের সময়। ধড়ফড় করে উঠে দেখে বেলা গড়িয়েছে। সময় হারিয়ে ফেলার বেদনায় আহত পাখির মতো উঠানে দাঁড়িয়ে টের পেয়েছে ছোট ঘরের দুয়ার আলগা।

'ও আজিনা কই গেলি?' ডাক দিয়ে ঘাড় ঘুরাতেই দেখে পেছনে আজিনা দাঁড়িয়ে। মইওর বিবি চমকে যায়। তার হৃদপিণ্ডের ভেতরে ভেতরে যোগ-বিয়োগের হিসেবের খেলা শুরু হয়েছে। শ্যামলামুখী আজিনার গালে-কপালে কাঁচা সবুজ রং। চুলের মোড়া কচি দূর্বার পালক। দুচোখের পাপড়ি অহেতুক কম্পমান। মইওর বিবি চেষ্টা করেও আজিনার চোখে চোখ রাখতে পারে না। যতোটা ছটফট করছে আজিনা সে এবার ততোটাই স্থির থাকার চেষ্টা করে।

—কই গেছিলি?

কথা ঘুরায় আজিনা। মুখে স্বভাবজাত আঁচল না চেপেই শব্দ করে হাসে। ওর হাসির শব্দ ছাপিয়ে মুকিমের ডাক-চিৎকার শোনা যায়।

—ভাইয়ের কান্দন শুনছোস?

—শুনছি। তুই গেছিলি কই শুনি?

—কই যামু?

মুখের রেখা যথাসম্ভব টান টান করেও আজিনা হাসি লুকাতে পারে না। মইওর বিবির ভ্রূ কুঁচকে ওঠে। এত সকাল সকাল কোথায় গিয়েছিল আজিনা? অত হড়বড়ানি ভাব ক্যান ওর? ক্রোধ সম্বরণ করতে খানিকটা প্রস্তুতি নেয় মইওর বিবি। পরের প্রশ্নে যায় না। আজিনা ঘরে ঢুকে আলনায় ঝুলানো একটা শাড়ি টানে।

—যাই। ডুব দিয়া আসি।

মাথার ভেতরে চিড়িক করে ওঠা গোসাটা থিতিয়ে আসে ক্রমশ। আজিনাকে মনোযোগ দিয়ে পরখ করে মইওর বিবি। হাবাগোবা অপবাদে যে আজিনার সংসার হয়নি আজ তার

দুচোখ দেখে সে থতমত খেয়ে যায়। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে তার। শ্বাস নেবার মতো বাতাস পায় না, এদিকে শরীরে বিঁধে যায় বাতাসের ফলা। বুকের ভেতরে গুমগুম করে ওঠা দহন জানান দেয়, পুনর্বার ঠকেছে সে। আড়ষ্ট জিভে কী জানতে চাইবে বুঝতে পারে না। আজিনাই নির্জনতা কেটে কথা আনে।

—অই, তুই ভাইয়ের কারবার দেখছোস? নিজেই আইজ বঁটি বিছরাইতাছে। কী চিক্কুর পাড়তাছে দ্যাখ দ্যাখ।

আজিনার হাসিতে তরঙ্গ উছলায়। মইওর বিবি হাসে না। আজিনার পরনের সবুজ শাড়ির জমিনের ছাপ উল্টো। শরীর রঙে ঢলো ঢলো। দুচোখে অবাস্তব সুখের ছায়া। এবার আগুন জ্বলে ওঠে মইওর বিবির চোখে, ‘ফজরের ওক্তে কই গেছিলি কইলি না?’ প্রশ্ন করে এবার আর জবাবের অপেক্ষা করে না মইওর বিবি, তিরলাগা হরিণীর মতো জঙ্গলের দিকে ছুটতে থাকে।

(রচনাকাল: ২০২০)

সাদা রক্ত

মায়ার বুক থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। সে মরে নাই—রক্তের উপচানো ধারায় খাবি খাচ্ছে শুধু। হাতের তালু চটচট করছে মায়ার। রক্ত লেগে আছে, রক্ত! এত রক্ত কোথা থেকে এলো ভাবাভাবির সময় নেই মায়ার। সে রক্তের উৎসমুখে দুধের বাচ্চাটাকে প্রাণপণে ঠেসে ধরছে বারবার। ওর হাতের বাঁধন দৃঢ়। বাচ্চাটা তবু কী করে যেন মায়ার হাত গলে আবার মেঝেতে পড়ে যায়

বুকের মিঠাপুকুরে হাহাকার ওঠে। মেঝেতে তাকিয়ে আলুথালু মায়া কাঁপতে থাকে। ছোট বাচ্চার পালক নরম ছোট দেহ। মাটিতে গড়িয়ে এখনই যেন মা মা করে কলকলিয়ে উঠবে। কিন্তু একটানা মা ডেকে শ্রান্ত শিশু ঘুমে বিভোর। সে নড়ে না। হাসে না। খেলে না। ডাকে না। তুলতুলে ওড়নার পোঁটলার ভাঁজে বেদিশ হয়ে ঘুমায়

'খোকা ঘুমালো পাড়া জুড়াল
বর্গী এলো দেশ
বুলবুলিতে ধান খেয়েছ
খাজনা দিবো কিসে?

খোকা ঘুমালে ফেরেশতার সঙ্গে কথা কয়। কে যেন বলে, 'তোর মাকে নিয়া যাব।' খোকা মায়ের বুকের অমৃত পান করতে করতে হাসে, 'ন...না।' আবার বলে, 'তোর মা নাই। নিয়া নিছি।' খোকা মুখ তুলে চায় না, মুটুর মুটুর হেসে বলে, 'এই যে আমার মা। আমার মুখে মায়ের দুধের ঘ্রাণ।' খোকা হাসে আর হাসে। তার হাসিতে মণি-মুক্তা ঝরে

মায়া মণি-মুক্তা কুড়াবার মতো মোজাইকের শীতল মেঝে থেকে খোকাকে লুফে নেয়। এবার সে হাতের বাঁধন আরও শক্ত করে। পাঁজরের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলে খোকাকে। খোকা আরাম পেয়ে চোখ খোলে না। মায়া স্তনাগ্র উন্মুক্ত করে খোকার নরম নরম ঠোঁট ফাঁক

করে। কেউ নজর দেয় ভেবে রঙিন আঁচলে আড়াল করে ঘুমন্ত দেহটাকে। রক্তে মায়ার বুকের আঁচল জবজব করে। সে ভেজা আঁচলে হাত বুলাতে বুলাতে ছেলেভুলানি গান গায়

'আয় ঘুম আয় বাগদিপাড়া দিয়
বাগদিদের ছেলে ঘুমায় জাল মুড়ি দিয়ে।

খোকা পেটে থাকতে একদিনও মাছ খেতে পারেনি মায়া। দূর থেকে কাঁচা মাছের গন্ধ পেলেও বমি আসতো ওর। ক্ষণে ক্ষণে বিবির পেট উগড়ানো দেখে মিজান ঘরে খাওয়াই বন্ধ করে দিয়েছিল। আর মাছ ছাড়া জগতের অন্যসব খাবারের প্রতি লোভী হয়ে উঠেছিল মায়া। বিশেষ করে ব্রয়লার মুরগির কষা মাংস আর আমচুর গলা ডাল দেখলে হুশ থাকতো না ওর। কাজ থেকে ফিরে সন্ধ্যায় মায়া নিজের জন্য মন দিয়ে রাঁধা-বাড়া করতো। শেষের দিকে পেটের ভারে নড়তে চড়তে পারত না তেমন। সেই সময়ে ডিমভাজি-ভর্তা-ভাত দিয়ে সে গলা পর্যন্ত খেয়ে উঠলে পেটের খোকাও শান্ত থাকতো বেশ

কোলের খোকা মায়ের বুক পেলে শান্ত একদম। মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঠোঁট গোল করে সে নিজের খাবার ঠিকই খুঁজে নেয়। শাল দুধ পায়নি খোকা। মাতৃস্তনে প্রথমবার ঠোঁট রাখতে গিয়ে নীল হয়ে উঠেছিল শরীর। নার্স তোয়ালেতে কচি শরীর জড়িয়ে তখনই ছুটেছে

রাত তখন নিঃসাড়। দিনরাত মিলিয়ে সেদিন হাসপাতালে চারজনের মৃত্যু হয়েছিল। তাই বুঝি অবিনাশী মৃত্যুর ঘ্রাণ ভাসছিল হাওয়ায়। মায়া তৃষিত চোখজোড়া দরজায় নিবদ্ধ করতে করতে গোঙাচ্ছিল। মার খেতে খেতে যে মায়া শতবার মরতে চেয়েছে সে হাসপাতালের হাওয়ায় মৃত্যুর ঘ্রাণ পেয়ে দম আটকে শুয়ে সন্তানের প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষা করেছে

'খোকন খোকন করে মা
খোকন গেল কাদের না
সাতটা কাকে দাঁড় বা
খোকনরে তুই ঘরে আয়।

স্বচ্ছ বাকশের ভেতরে রাখা খোকনের নাজুক দেহে সেই সময়ে ওম দিচ্ছিল দেবদূতেরা। আর মায়া স্তনের ভারে ছটফট করছিল। সমুদ্দুরের জোয়ারের মতো দুধ নেমেছিল বুকে, গন্তব্য না পেয়ে পাথর করে তুলেছিল স্তনজোড়া। মুহূর্মুহূঝিলিক দিয়ে

উঠছিল নরম মাংসপিণ্ডেরঅভ্যন্তরে। ব্যথার তোড়ে আছড়েবিছড়ে কাঁদতে চেয়েও পারেনি মায়া। বোন ছায়ার হাত ধরে গুমরে উঠেছে, ‘আমার মানিকরে আইনা দে।

ছায়া ব্যস্ত তখন। সে বুবুর পাথরসদৃশ স্তন থেকে ঘি রঙা দুধ বের করছিল। মেলামাইনের ঘোলা স্যুপ বাটিতে ঘন সরের মতো দুধ দেখে দাঁত চেপে ঠোঁট কেটে ফেলেছিল মায়া। আর ছায়া স্তন চেপে চেপে দুধ ফেলে সদ্য প্রসুতিকে স্বস্তি দেবার চেষ্টা করছিল। ছায়া নিজে মোটেও স্বস্তিতে ছিল না। ‘আবিয়াইত্তা’ অপবাদ পাওয়া ছায়া এত দিনে বুঝে গেছে মাতৃস্তন আর নারী স্তনের ফারাক

হাসপাতালের নিঝুম করিডোরে আগের রাতে তার স্তনে থাবা পড়েছিল বোন জামাইয়ের। এ থাবা ঝানু শিকারির। এ থাবা ভয়ংকর, পুনঃপুন ঘায়েল করতে চায় শিকারিকে। এসব কথা বুবুকে বলেনি ছায়া। তবু মায়া জানে। জানে বলেই সন্তানহীনা বাঘিনী মায়া স্বামীর দিকে থাবা বাড়ায়

—তোর বজ্জাতি আমি ছুটামু এইবার। কোলের মানিকরে পাইয়া লই

কোলের মানিককে ঐদিন বিকালেই কোলে পেয়েছিল মায়া। আর মায়াকে শাসিয়ে হাসপাতাল ছেড়েছিল তার স্বামী মিজান। বিল পরিশোধ করতে মায়ার মা তার হাতের একমাত্র চিকন চুড়িটা বিক্রি করেছিল। আর মায়ার বাবা এর ওর হাতে পায়ে ধরে চড়া সুদে টাকা ধার নিয়েছিল। হাসপাতালে আসার দিন নিজের সঙ্গে কানাকড়িও আনতে পারেনি মায়া। এখানে পা দেবার আগেই লুট হয়ে গিয়েছিল ওর সকল সঞ্চয়

চাকরির রক্ত-ঘাম ভেজা টাকা নিঙড়ে নিঙড়ে এসেছিল এই সঞ্চয়। ছুটি পায়নি, অর্থও প্রয়োজন তাই বাচ্চা প্রসবের আগের দিন পর্যন্ত গার্মেন্টসে কাজে গিয়েছে। মেশিনের ঘটঘট ঘটঘট শব্দের তালে পেটের বাচ্চাটাও দুলেছে। দুলতে দুলতে মাঝরাতে মাতৃথলি ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চেয়েছে। পানি ভেঙেছে এক গাঙ। কী করে ঐদিন হাসপাতালে পৌঁছেছিল মায়া জানে না

আজও কীভাবে কার সঙ্গে এখানে এসেছে ওর মনে নেই। চৌকিতে গোলাপি পদ্ম হয়ে ফুটে থাকা মানিককে লাথি মেরে বিছানা থেকে ফেলে দেয়ার দৃশ্যটা মনে পড়ছে শুধু। মানিক ঘুমিয়েই ছিল। দেয়ালে ঝোলা একটা পেটমোটা টিকটিকি আলোভূক পোকার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ার পাঁয়তারা করছিল। কামে জর্জরিতমিজান অনিচ্ছুক মায়াকে চেপে ধরেছিল বিছানায়। তার শরীরে তখন বেশুমার জ্বর। অতৃপ্তির তাপ অঙ্গের ভাঁজে ভাঁজে।

বিবির না শুনবার সময় নাই। তরঙ্গ ওঠার দরকার নাই। শুকনো জমিনে তিরের ফলায় তাই সে গেঁথে দিয়েছে সোহাগের চিহ্ন। এমনই এক সঙ্গমের উত্তাপে জন্ম নিয়েছিল বলেই হয়তো নিজের ঔরসজাত শিশুকে লোমহীন বুকের মানুষটা সীমারের মতো মেঝেতে আছড়ে ফেলেছিল। মুহূর্তের মধ্যে পাগলা ঘোড়ার মতো ঘুরে দাঁড়িয়েছিল মায়া

'আম পাতা জোড়া জোড়
মারব চাবুক চড়ব ঘোড়
ওরে বুবু সরে দাঁড়
আসছে আমার পাগলা ঘোড়া
পাগলা ঘোড়া ক্ষেপেছে, চাবুক ছুঁড়ে মেরেছে।

চারমাসের ক্রন্দনরত মানিক বাবার নিষ্ঠুরতা সহ্য করতে পারেনি। মেঝেতে পড়েই থেমে গেছে। মায়াও ছাড়েনি। যতক্ষণ শ্বাস ফুরায়নি ততক্ষণ মিজানের গলা চেপে রেখেছিল। ঐ সময়ে এক ঝলকে চম্পার মুখটা ওর চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। মিজানের প্রথম বিবি চম্পা বলেছিল, 'একদিন জুত মতো পাইলে হারামির গলাটা চিপ দিয়া ধরমু।

সেদিন চম্পা অন্ধকারে পথ আটকেছিল ওর। শুনেছে মেয়েটা বেশ্যার খাতায় নাম লিখিয়েছে। তাই রগড়ই অমন। আঁধার না হলে পথে নামে না, শরীর না ছুঁয়ে কথা বলে না

—খুব সুখ দিতাছে বুঝি হারামিটা। বুঝবি বুঝবি, বছরও ঘুরবো না। দেখবি টাউয়া উদাম শালা ফুটুস

চম্পার হাত থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দৌড়ে ঘরে ঢুকেছিল মায়া। অনেকক্ষণ ধরে বাসনা ভরা সাবান দিয়ে হাত ধুয়েছিল। তারপর ঘষে ঘষে সময় নিয়ে গোসল করেছিল। তখনও গার্মেন্টসে ঢোকেনি সে। মিজান একাই কাজ করতো। বাড়ি ফিরলে নতুন বিবির প্রতি সোহাগ উথলে উঠত তার। সেদিনও অপেক্ষার পর নিষ্পেষণের ক্ষণ এসেছিল। কিছুতেই আড় ভাঙছিল না মায়ার দেহের। মিজানই বা ছাড়বে কেন, সে তার কলমা পড়া বিবি, যখন স্বামী ডাকবে তখনই বিছানায় যেতে তৈরি থাকবে। স্বামীর আগ্রাসী থাবায় বিদ্ধ হতে হতে ঐদিনই প্রথম কেঁদেছিল মায়া। বুঝেছিল বাজারের মেয়েমানুষটা সত্যি বলে গেছে

মায়া ভালো করে মানিককে বুকে চেপে ধরে কপালে দীর্ঘ একটা চুমু খায়। চুমুতে খোকার নজর টিপ লেপ্টে যায়। কাজলের ছোপ পড়ে মায়ার শুষ্ক ঠোঁটে। মুঠোবন্দি ফোনটা কেঁপে ওঠে আচমকা। ওপাশে ছায়ার ফিসফাস শোনা যায়

—বুবু পুলিশ শুয়োরটার লাশ নিতে আসছে। তোমারে খুঁজতেছে

মায়ার মুখাবয়বে কোনো আলোড়ন ওঠে না, ব্যথার চিহ্ন ফোটে না। অনেকক্ষণ হলো সে হাসপাতালে এসেছে। ফিনাইল আর ডেটলের ঝাঁঝালো ঘ্রাণ মেখে গেছে শাড়িতে। রক্তের আধারও টুবুটুবু হয়েছে। দেবদূতেরা আজ তাদের কোমল হাত তুলে নিয়েছে। খোকাকে ওম দেওয়া বাকশে ঢুকায়নি। খোকাও চোখ মেলে তাকায়নি

মোবাইল ফোনটা কেঁপে ওঠে আবার। মায়া কাঁপে না। কাটাকুটি খেলে রক্তভেজা আঁচলে

'লেখো দেখি বা

বা

ব কেটে ছ করো

ঘ কেটে গ কর

হয়ে যাক ছা

বাঘ তুই ভাগ।

আচমকা মানিককে বুকে ধরে ছুটে শুরু করে মায়া। রক্তের বিভ্রম কাটে না। মানিকের দেহটা মায়ার দেহের সঙ্গে যত চাপ খায় তত টাটিয়ে ওঠে স্তন। ছুটন্ত মায়ার স্তনাগ্র ভেদ করে রক্ত ঝরে। এই রক্তের রং দুধ সাদা

(রচনাকাল:. ২০২১)

লিলিয়ানা ও একটি ঘরবউনি সাপ

১

হারিয়ে যাওয়ার ঠিক তিন সপ্তাহ পাঁচ দিন পর লিলিয়ানা গর্ভাবস্থায় ফিরে এসেছে

ওকে সতর্ক পায়ে বাড়িতে ঢুকতে দেখে আম্মা চিৎকার করে ওঠেন, ‘প্যাট বাঁধায় আসছে দ্যাখো গিয়া।’ আম্মার কণ্ঠস্বর এত অশ্লীলভাবে কানে ধাক্কা দেয় যে মুহূর্তের মধ্যে আমি ভুলে যাই আমাকে লিলিয়ানার কাছে যেতে হবে। আমি পা ফেলতে পারি না। শরীর ভারীলাগে

অভিমানী লিলিয়ানা বারান্দার এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে। বারান্দার গাছগুলোতে মড়ক লেগেছে। মেঝে আর গ্রিল মিলিয়ে নানান আকৃতির সাতান্নটা টব বারান্দায়। আগাছা শ্রীহীন টবগুলোর শুকনো মাটি আঁকড়ে ধরেছে। পর্তুলিকার গাছগুলো মাটিতে নুইয়ে দিয়েছে মিলিবাগ। রুয়েলিয়ার আধফোটা কলিতে কালো পিঁপড়ার দল নাচছে। মাল্টিফ্লোরা পিটুনিয়ার নিষ্প্রাণ গাছেরা কলি ছাড়েনি এখনো। মহামারীর দিনে সাধারণ ছুটি ঘোষণার কয়েক দিন আগে ফাল্গুনী আমাকে কীটনাশক এনে দিয়েছিল। কোথায় রেখেছি মনে করতে পারছি না

ফুলহীন সাদা অপরাজিতার টবের পাশে দাঁড়ানো আমার সিনোরিটা উজ্জ্বল চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। লিলিয়ানার জ্বলজ্বলে চোখজোড়া দেখে বুক তোলপাড় করা আনন্দ জাগছে আমার। লিলিয়ানা! কতদিন পর দেখছি ওকে

—যাও বৌমা সোহাগ করো এখন। আমার ছেলে তো বাড়িতে থাকে না, মেহমানের মতো আসে। সে তো আর জানে না মাছভাত দিয়া সংসারে সে কালাচ সাপ পুষতেছে।

একদিন ছোবল খাইলে বুঝবো। আমার হইছে জ্বালা...সইতে পারি না, কইতেও পারি না... চাইরদিকে সব জাতি সাপের মতোন ফণা তুইলা থাকে

আম্মার কথা আর শুনতে পাই না আমি। টলতে টলতে লিলিয়ানার কাছে যাই। হাত বাড়াতেই নরম পায়ে আমার শরীর ঘেঁষে দাঁড়ায় লিলিয়ানা। ঘাড় নিচু করে আছে ও। এত দিনের আদরের ক্ষতিপূরণ পুষিয়ে দেওয়ার কোনো চেষ্টাই ওর মধ্যে দেখা যাচ্ছে না। আমি লিলিয়ানার চিবুকে হাত দিই। ওর চোখের আলো নিভে গেছে। ওকে এখন বিষণ্ন দেখাচ্ছে। বিমর্ষ লিলিয়ানা আমার বুকে নিজের মুখ লুকিয়ে রাখে

আমার কাছ থেকে দূরে থেকে কষ্টে ছিল কি লিলিয়ানা? নাকি ভালোবাসার সঙ্গীকে ছেড়ে আসায় এমন বিমর্ষ ও

লিলিয়ানা আমার হাত ছাড়িয়ে শোবার ঘরে চলে যায়। হাই তুলতে তুলতে শরীর ভাঁজ করে ও বিছানায় শুয়ে পড়ে। ওর চোখে-মুখে এখন প্রশান্তির ঝাপটা। আমার দিকে তাকিয়ে প্রিয়ভঙ্গিতে নাক কুঁচকে নিয়ে ও চোখ বন্ধ করে। পিংকিং আপে শায়িত লিলিয়ানাকে অপূর্ব সুন্দরী লাগছে

দেখে ঘোর লাগে চোখে। যেন এক অন্য লিলিয়ানাকে দেখছি

“The secret in their eyes” মুভির একটি দৃশ্যে লিলিয়ানার নগ্ন মৃতদেহ বিছানা থেকে মেঝেতে ছড়িয়ে থাকে। আমার লিলিয়ানা হারিয়ে যাওয়ার পর থেকে প্রতি রাতে মুভির লিলিয়ানা আমার সামনে হাজির হয়। মেয়েটির সুকোমল শরীরের ছোপছাপ রক্ত আর আধখোলা চোখের বিস্ময় আমার অন্তরে বিদ্ধ হতে হতে হারিয়ে যায়। আবার ফিরে ফিরে আসে স্বপ্নডোবা ঘুমের ভেতরে

দুঃস্বপ্ন থেকে ফিরে এসে আমি লিলিয়ানার নরম শরীরে হাত বুলাই

আহ লিলিয়ানা! আমার সিনোরিটা! কতকাল শান্তিতে ঘুমাওনি তুমি? ঘুমাও। আয় ঘুম..

২

লিলিয়ানা ফিরে আসার পর আমার শম্বুক বেলা ঝড়ের গতিতে এগোয়। ও ঘুমিয়ে গেলে বেদখল হওয়া উনুনের আঁচ থেকে নিজেকে সরিয়ে বারান্দায় এসে রোজ আলোর ব্যাসার্ধ মাপি। গাছেদের দেখি। বৈশাখের সুষম হাওয়ায় গাছগুলো তরতর করে বাড়ছে। এদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লিলিয়ানার পেটও স্ফীত হচ্ছে। বেচারির খাওয়া বেড়েছে খুব

এখন লিলিয়ানার জন্য কী করলে ভালো হবে তা জানতে ফাল্গুনীকে ফোন দিই। এই পৃথিবীতে ফাল্গুনীই আমার একমাত্র চেনা মানুষ যে দুনিয়ার সকল বিষয়ে জ্ঞান রাখে

—ওর খাবারও স্টক করে রাখ। অবস্থা ভালো না, ছুটি বাড়বে আরও। ঘন ঘন খাবার দিবি, আবার খুব বেশি দিস না। বমি করে ভাসাবে। তখন আরেক কেলেংকারি হবে। তোর শাশুড়ি আবার সাপ নিয়ে পড়বে। এমনিতেই ঝড়-বাদলের দিন আসছে। সাপের প্রকোপ বাড়বে। তার গল্পও। আমি ঠিক করেছি। মহামারীর দিন ফুরালে তোর শাশুড়ির জন্য বাকশে ভরে একটা দাড়াজ সাপ নিয়ে আসবো। বলবো, খালাম্মা নেন, পোষেন

আমার খিলখিল হাসির শব্দে লিলিয়ানা আহ্লাদী ভঙ্গিতে আমার কোলে মাথা রাখে। আম্মা রান্নাঘর থেকে মাথা বের করে আমাদের দেখেন। ফরিদাও ঘর মোছায় বিরতি দিয়ে উৎসুক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকায়। কত দিন হাসিনি এমন করে

ওপাশ থেকে ফাল্গুনী বলে, ‘বাইরে বের হলে খুব সাবধান থাকবি। খোলা বাজারে যাবি না। ওয়ান স্টপ মলে যাবি। লোকজনের কাছ থেকে দূরে দূরে থাকবি। আবার বলছি শোন, লিলিয়ানার জন্য বেশি করে খাবার কিনে রাখিস। আর তোর জন্য প্যাডও কিনিস বেশি করে। ছুটি কত দীর্ঘ হয় ঠিক নেই। আর ঘরে ফিরেই গোছল করে নিবি আগে।

লিলিয়ানাকে গোছল করিয়ে আমি পোশাক পাল্টাই। ওর খাবার ফুরিয়েছে। ‘সুইট হার্ট’ এর বাকশো পুরো খালি। ফয়সাল কাঁটাবন থেকে অনেক খাবার এনেছিল। ক’দিন হলো এত ক্ষুধা বেড়েছে আমার সিনোরিটার! কেবল খাবার চাই তার। ভারি শরীরে সে থপথপ করে হাঁটে আর পড়ে পড়ে ঘুমায়। ফাল্গুনীর কথাটা মনে পড়ে আমার হাসি পায়, ‘এই দফা ডেলিভারি হলে লাইগেশন করিয়ে আনবি। নইলে জ্বালিয়ে খাবে তোর সিনোরিটা। তোর শাশুড়িও।

প্রায় এক মাস পর বাইরে যাচ্ছি। আশেপাশের দোকানপাট খোলা নেই। কাচারি বাজারের দিকে লাজ ফার্মার বড় একটা শপিং মল আছে। ওদিকেই যেতে হবে

'কিছু লাগবে আম্মা? একটু বাইরে যাবো। রোজার বাজার তো করা হয়নি। আপনার ওষুধও শেষ। আপনার ছেলে এই সপ্তাহেও ফিরতে পারবে না।' বলতে বলতে আমি হাতে গ্লাভস পরি। আম্মা ভ্রু কুঁচকে তাকান। দুদিন ধরে আমার সঙ্গে কথা বলছেন না তিনি

দুদিন আগে লিলিয়ানা আম্মার ঘরে বমি করেছে। খাবারের প্রতি ওর আকর্ষণ যেমন বেড়েছে তেমনি সে খুব অনাসৃষ্টিও করছে। আমি কান মলে দিয়েছি ওর

আমি কান পাতি। আম্মা কিছু বলছে

—কার্বলিক অ্যাসিড না কি কয় সেইটা আইনো। বারান্দায় যেই গাছের বাহার বসাইছ। জঙ্গল হইছে। ঝড়-তুফানের দিন এহন। ফুলের গন্ধে সাপখোপ আসবো। আমার ভাই কইল ওদের পাড়ায় দোতলার এক বাড়িতে মালিকরে সাপে কামড়াইছে। ফুলের গন্ধে শ্যামাসুন্দরী খাল থেইকা উইঠা দোতলা বাইয়া সাপ ঘরে ঢুকছে। আর পারলে তোমার ছাওটারে বাইরে ফালায় আইসো। শুনি সারা দুনিয়ার বাতাস বিষাক্ত হইয়া যাইতাছে কি না কি ভাইরাসে। আর আমার তো ঘরেই বিষ

দুদিনের কথা এক নিশ্বাসে সেরে ফেলেন আম্মা। আমার বলতে ইচ্ছে করে, সাপের আপনার মতো ঘ্রাণশক্তি নেই আম্মা। কিছু বলি না আমি। চুপচাপ বেরিয়ে পড়ি

৩

—এই যে মায়া, চোখে দেখা যায়? যায় না। অজগরের মতোন সারা শরীর প্যাঁচায়া ধইরা রাখে। তুই ছাড়াইতে যাবি, ফোঁস কইরা ফণা তুলবো, ছাড়াইতে পারবি না, ছাড়াইলে তোরই মরণ। এর চেয়ে সাপের সাথে জড়াজড়ি কইরা বাঁইচা থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ

—বাবা তুমিও কি আমার শাশুড়ির মতোন সাপ বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠলে নাকি? সাপের কথা শুনতে ভাল লাগে না আমার। ফোন রাখছি

বাবাকে আমি আর কোনো কথা বলার সুযোগ দিই না। কর্ডলেস ফোনটা বিছানায় ছুঁড়ে ফেলি। লিলিয়ানাকে খাবার দিতে হবে। চারটি তুলোতুলো বাচ্চা নিয়ে ও বিছানায় শরীর টান টান করে শুয়ে আছে। আমাকে দেখে ওরা সবাই খচমচ করে বিছানা ছেড়ে

আমার শরীরে উঠতে শুরু করে। ছোট্ট বেঞ্জামিন, আমার বেঞ্জু এত পাজি, এখনই ঘাড়ে উঠতে শিখে গেছে

আমি ওদেরকে বেশিক্ষণ প্রশ্রয় দিই না। ফয়সাল অনেক রাতে ফিরেছে। ছুটির ভেতরে ও ঢাকায় আটকা পড়েছিল। অনেকদিন পর সে বাসায় ফিরেছে। ফিরে রাতের খাবারও খায়নি। ছুটির সকালে পোলাওর চালের খিচুড়ি, তেলডুবানো ডিমভাজা আর টমেটো বা তেঁতুলের চাটনি করে দিলে ফয়সাল খুব পছন্দ করে খায়। এমনিতেই আমার ঘুম ভাঙতে দেরি হয়েছে। তারপর এলো বাবার ফোন। ফয়সাল ওঠার আগেই এখন নাস্তা তৈরি করে ফেলতে হবে

রান্নাঘরে পা দিতেই নাকে শুকনো মরিচ পোড়া ঘ্রাণ এসে ধাক্কা দেয়। আলুভর্তা, ঘন ডাল আর ভাত নিয়ে আম্মার ব্যস্ততা দেখতে দেখতে নির্লিপ্তমুখে এক মগ র চা বানিয়ে আমি বারান্দায় আসি। আম্মা পেছনে পেছনে বলে, 'ছেলেটা অনেকদিন পরে ফিরলো। নিজে দূরে না থাকো, তোমার ছাও-পাও গুলারে দূরে রাইখো।

আম্মার ঝাঁঝালো কণ্ঠের আঁচে আমার মনে পড়ে যায়, রাতে ফয়সাল আর আমার মৈথুনের কথা। মুহূর্তেই সচকিত হয়ে ওঠে আমার শরীরের প্রতিটি রোমকূপ। রাতের অপরিমেয় সুখ ভুলে বিষের পাত্রে ডুবতে থাকি আমি। আমার দমবন্ধ হয়ে আসে

আম্মার ঘরের সঙ্গে আমাদের ঘরের পার্থক্য শুধু একটা দেয়াল। মাঝেমাঝে আমার মনে হয়, এই দেয়ালটা ইট-সিমেন্টের না, হাওয়ার তৈরি। হাওয়ার ফিনফিনে পর্দায় আমার আর ফয়সালের সুখ-সান্নিধ্য ধাক্কা খায়

বিয়ের পর পর আম্মা আমাকে সকালে রান্নাঘরে দেখলেই আঁতকে উঠতেন, পাড়া-প্রতিবেশীশুনিয়ে বলতেন, 'ফরজ গোছল ছাড়া রান্নাঘরে পা দিবা না।' রাতে আমি ফয়সালের আলিঙ্গন থেকে নিজেকে বিযুক্ত করতে করতে বলতাম, 'প্লিজ আজ না, মা সব টের পান। আমার ভীষণ অস্বস্তি হয়। সকালে উনার দিকে তাকাতে পারি না আমি।

ফয়সাল হাসতো, 'ইস, মা যেন জানেন না এসব!' মাঝেমাঝে নিজেকে সমর্পণ করতে করতে আমিও হাসতাম। সতেরো বছর হয়ে এলো এখন আর হাসি পায় না আমার

আম্মা এখনো আগের মতোই বলেন, 'লাভ কি অত শরীর ভিজাইয়া!

শব্দগুলো সাপের মতো হিল হিল করতে করতে আমার কানের ভেতরে ঢুকে যায়। নীল বিষের স্রোতে আমার শিরদাঁড়ার ভাঁজ ভেঙে যায়। নিজেকে শক্তখোলের ভেতরে

ঢোকাতে ঢোকাতে আমি মেঝেতে বসে পড়ি। আমার দেহের ভারে টব কাত হয়ে পর্তুলিকা ফুলের নরম দেহ মুচড়ে যায়

হঠাৎ আমার কোলে মুখ গোঁজে কেউ। লিলিয়ানা! আমার সিনোরিটা

লিলিয়ানা সদলবলে বারান্দায় এসেছে। আমি ওদের আদর করতে করতে সবুজে চোখ রাখি। গাছগুলো ভীষণ সজীব এখন। পিটুনিয়ার টবে ফুল ধরার জায়গা নেই। রুয়েলিয়ার গোলাপি বেগুনি তোড়াগুলো লাজুক ভঙ্গিতে হাসছে। সাদা-নীল অপরাজিতার লতা ছড়িয়েছে বারান্দার গ্রিলের এপাশ থেকে ওপাশ। ফুলে ফুলে ছেয়ে থাকা পর্তুলিকার টবের কোনায় দাঁড়িয়ে লিলিয়ানা গ্রিলের বাইরে মাথা ঢুকিয়ে দেয়। ছানাপোনারা মায়ের মতো বাইরে তাকানোর সাহস করতে না পেরে আমার পায়ের পাতায় শরীর গুটিয়ে শুয়ে চোখ পিটপিট করে

ফুলের শোভায় আমার মন ভরে যায়। আমি আদুরে কণ্ঠে ডাকি, 'লিলিয়ানা...তোর বাবুদের করোনামুক্ত পৃথিবী দেখা।

৪

বারান্দায় সাপের খোলস পড়ে আছে শুনে আমি আঁতকে উঠি না। আঁতকে উঠি আম্মার বিলাপ শুনে

আম্মা চিৎকার করে চলেছেন। বারান্দার গ্রিল কাঁপছে। টবগুলো কাঁপছে। রৌদ্রস্নাত সাদা-বেগুনি পিটুনিয়া ঝলমল করছে। ওদের কাছ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে আমি চমকে উঠি

বেবি টিয়ার্সের জলভরা লতার পাশে পড়ে আছে বাদামি, কালো ফুটিফুটি এক খোলস। সাপের খোলস

আমি ফয়সালের শরীর ঘেঁষে দাঁড়াই। ওর আধখোলা বুকের নখের আঁচড় দেখা যাচ্ছে। কাল রাতেও কেঁদে কেঁদে খামচে দিয়েছি ওকে। হাতের আদরে আমার বেদনা

জুড়াতে জুড়াতে ফয়সাল হেসেছে, ‘লিলিয়ানার মতোই হয়ে গেছো তুমি, আমার আদুরে বেড়াল।

ফয়সালের হাত এখনো ছুঁয়ে আছে আমায়

—তুমি ভেতরে যাও

ফরিদা হাতের কাজ ফেলে ছুটে এসেছে। উচ্চকিত স্বরে সে বলছে, ‘কোন সাপ খালাম্মা?

আম্মার মুখে শোনা সব সাপের নাম একে একে বলছে ফরিদা। গোখরা, কালাচ, দাড়াজ, শঙ্খচূড়, মাইছালাত, ধোঁড়া, বড়া, মাইট্টা, গোলবাহার, ঘরবউনি...বলতে বলতে ফরিদা হাঁপিয়ে ওঠে। শুনতে শুনতে আমি কাঁপতে থাকি। পিটুনিয়ার রংবেরংয়ের পাপড়িগুলোও কাঁপতে থাকে

—এই বউ হইলো আসল ঘরবউনি সাপ। ঘরে বায়-ছায়, ঘরেই খোলস ছাড়ায়। ঘরের খাইয়া ঘরের মানুষরেই কামড়ায়

ফয়সাল আম্মার দুহাত আঁকড়ে ধরে উচ্চস্বরে বলে, ‘মা, থামো তো। আমি দেখছি। এ সাপের খোলস না মা, কোথা থেকে কীউড়ে এসেছে। আমি ফেলে দিচ্ছি দাও।

ফয়সালের হাতের পাতলা খসখসে বস্তুটা দেখে আমার শ্বাসরোধ হয়ে আসে। আমার লিলিয়ানা! ওর সন্তানেরা! আইরিন, পাবলো, রিও, বেঞ্জু? ওরা কোথায়

আমার মনে পড়ে যায়, করোনাকাল শুরুর আগে আম্মা দারোয়ানকে পাঁচশ টাকা দিয়েছিলেন, লিলিয়ানাকে বস্তায় ভরে দূরে ফেলে আসতে। অভিমানী লিলিয়ানা বাড়ি ফেরেনি তিন সপ্তাহ পাঁচ দিন

আমি ফয়সালের হাত খামচে ধরি, ‘লিলিয়ানা কোথায়? ওর বাচ্চারা?

—বাঞ্জা মানুষ দিনরাইত বিলাই ছাও আর জঙ্গল নিয়া পইড়া থাকে। গুচ্ছের টাকা খরচ করে। আমার ছেলের ঘাম ঝরানির টাকা, ভাইসা আসে নাই

ফয়সালের বজ্রকণ্ঠ, আম্মার বিষবাক্য বাতাসে উড়িয়ে আমি এ ঘর থেকে সে ঘরে ছুটতে থাকি

আমার চারদেয়ালের দৃশ্যপট বদলে যেতে থাকে। সবকিছু অচেনা লাগে। আমি আমার ঘর খুঁজে পাই না। লিলিয়ানার ঘর খুঁজে পাই না। সমুদ্রজলে সব ডুবে গেছে। চমকে

দেখি আমার পায়ের নিচে অতল সমুদ্র। সমুদ্রের উড়ুক্কু ঢেউয়ে পা ফেলে আমি ছুটতে থাকি। ছুটতে থাকি

কোথায় পৌঁছে যাই আমি জানি না। এখানে আমার জন্য কেউ নেই, কোথাও কেউ নেই

আমার লিলিয়ানা! আমার সিনোরিটা! আমার আইরিন, পাবলো, রিও, বেঞ্জু... কেউ নেই

(রচনাকাল : ২০২০)